বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থাবলী।

প্রবন্ধমালা।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

সপ্তম সংস্করণ।

কলিকাতা,

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
২১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৭।

বিজ্ঞাপন।

প্রবন্ধমালা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা, বালকবালিকা-দিগের শিক্ষার উপযোগী করিতে যথাশক্তি যত্ন করা হইয়াছে। ইহার ভাষা সহজ করা গিয়াছে, এবং আবশ্যকবোধে নানাবিধ বিষয় ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে।

বিদেশীয় লোকের জীবনচরিত পাঠ অপেক্ষা, স্বদেশীয় মহৎ ব্যক্তির জীবনবৃত্ত পাঠে বালকদিগের অনেক উপকার হইয়া থাকে। বাল্যকাল হইতেই বৈদেশিক লোকের বিবরণ পাঠ করিলে স্বদেশের প্রতি মমতা বা আস্থা কিছুই থাকে না। সুতরাং শিক্ষা উদাসীন হয়, মানসিক ভাব বৈদেশিক হয়, এবং স্বজাতি-স্নেহ বিলুপ্ত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান গ্রন্থে ভারতবর্ষের কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে নীতি জ্ঞানের সহিত বালকদিগের স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রিয়তা জন্মিতে পারে।

অবিচ্ছেদে এক বিষয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে পাঠক ও শিক্ষক, উভয়েরই বিরক্তি জন্মিয়া থাকে। এজন্য উপস্থিত পুস্তকে ইতিহাস, জীবন-বৃত্ত, বিজ্ঞান, স্থানীয় বিবরণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ও চিত্তামোদকর নানা বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, প্রবন্ধমালার "শিষ্টাচার" ও "শাস্ত্রালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় বেকনের সন্দর্ভ হইতে এবং "ভারত-মহিলার দয়া ও প্রভুভক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত নাইটন্ সাহেবের লিখিত "হিন্দুললনা" নামক সন্দর্ভ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহার ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিবরণ প্রভৃতি, টড্, মালকম্, কানিংহাম্, ম্যাক্‌গ্রেগর, প্রক্টরপ্রভৃতির গ্রন্থ এবং তত্ত্ববোধিনী, রহস্যসন্দর্ভ প্রভৃতি সাময়িক পত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সূচী।

প্রবন্ধমালা।

শিক্ষা ও উন্নতি।

মনুষ্য এই বিশাল সংসারে ক্ষুদ্রতর জীব। দয়াময় জগদীশ্বর এই ক্ষুদ্রতর জীবকে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দিয়া, ভূমণ্ডলের অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। মানব জ্ঞান ও ধর্ম্মে ভূষিত হইলে, যেমন পরম পবিত্র সুখভোগে সমর্থ হয়, তেমন আর কিছুতেই নহে। জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক মনুষ্য নরলোকের অদ্বিতীয় ভূষণ। তাঁহার মুখমণ্ডলে নিরবচ্ছিন্ন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিরাজ করে, হৃদয় সাধুতায় পরিপূর্ণ থাকে, এবং মন ইতর-প্রাণি-ভোগ্য অকিঞ্চিৎকর বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ সুখ-প্রদ উৎকৃষ্ট বিষয়ের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। তরঙ্গিণী যেমন আপনার বারিরাশি চারিদিকে বিস্তার করিয়া, ভূভাগ ফলপুষ্পে শোভিত করে, বিদ্যালোকসম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ মানবও তেমন আপনার জ্ঞান ও ধর্ম্মবলে সাধারণের হৃদয় বিবিধ গুণগ্রামে ভূষিত করিয়া থাকেন। বিদ্যাসম্পন্নেরা সর্ব্বদা উন্নত থাকিয়া, উচ্চতর বিষয়ের দিকে

ধাবিত হন। বিদ্যাহীনের হৃদয় অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, বিদ্বানের অন্তঃকরণ জ্ঞানের আলোকে সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাকিয়া, অনির্ব্বচনীয় প্রীতির উৎপত্তি করে। লোকে বিদ্যার প্রসাদে অতি সামান্য অবস্থা হইতে সংসারে উন্নত অবস্থাপন্ন ও সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন। সুবিদ্বান্ ও সুশিক্ষিত হইতে হইলে, স্বাবলম্বন থাকা আবশ্যক। যাহার স্বাবলম্বন নাই, সে কোন বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে পারেনা। আত্মনির্ভরের ভাব মনুষ্যকে সর্ব্বদা কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরিশ্রমশীল করে। কষ্টসহন ও পরিশ্রমবলে লোকে দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, উন্নতিলাভে সমর্থ হয়। অধিকন্তু আত্মাবলম্বন থাকিলে আত্মাদর জন্মে। আপনার প্রতি আদর ও আস্থা না থাকিলে, মনুষ্য স্বকর্ত্তব্যসাধনে সর্ব্বদা উদাসীন হয়। পরমুখপ্রেক্ষী মানবগণের কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না। তাহাদের শিক্ষা প্রগাঢ় হয় না, কর্ত্তব্যবুদ্ধি বলবতী থাকে না, এবং মনোবৃত্তি তেজস্বিনী হয় না। তাহারা সকল বিষয়েই পরের মুখের দিকে চাহিয়া, মানব নাম কলঙ্কিত করে।

যাঁহারা সংসারে উন্নত অবস্থার অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিদ্যা, ধর্ম্ম ও স্বাবলম্বন শিক্ষা করিয়াছিলেন। পুরাবৃত্তপাঠে অবগত হওয়া যায়,

দরিদ্রের গৃহ হইতেই অধিকাংশ মনস্বী ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই স্বাবলম্বন-বলে সুশিক্ষা পাইয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। আত্মাবলম্বন, বিদ্যা ও ধর্ম্মশিক্ষা না হইলে উন্নতি হয় না।

যখন প্রবল-পরাক্রান্ত সম্রাট আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন আমাদের দেশে একজন দুঃখী বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে একটি বালক জন্মগ্রহণ করে। ভূমিষ্ঠ বালকের নাম গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী *। মানুষ স্বাবলম্বন ও বিদ্যা-বলে কিরূপ উন্নত অবস্থাপন্ন হয়, তাহা এই গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জীবন-বৃত্তান্ত পাঠে জানিতে পারাযায়। নবদ্বীপের অগ্নিকোণে কুমারখুলি নামক স্থানে গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জন্ম হয়। এই সময়ে নবাব শায়েস্তা খাঁর হস্তে বাঙ্গালার শাসনভার ছিল। গোবিন্দের পিতা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন, অতিকষ্টে স্ত্রী ও পুত্রটি লইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। একদা গোবিন্দ সমবয়স্ক একটি বালকের মুখে 'লাউ চিঙ্গড়ির' বিবরণ শুনিয়া, তাহা খাইতে মাতার নিকটে অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার মাতা দারিদ্র্যবশতঃ মৎস্য ক্রয়

* গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমাদের দেশে মুকুট রায় নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু মুকুট রায় প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিজের নাম নহে। উহা তাঁহার পুত্রের নাম।

করিতে অসমর্থ হইলেন। গোবিন্দ ছাড়িবার পাত্র নহেন, 'লাউ চিঙ্গড়ি' খাইবার জন্য বিলক্ষণ আব্দার আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে একজন মৎস্য-বিক্রয়িণী তথায় উপস্থিত হইল। গোবিন্দের জননী ধারে মাছ কিনিয়া, পুত্রের জন্য 'লাউ চিঙ্গড়ি' রাঁধিতে প্রস্তুত হইলেন।

মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইল। মৎস্য-জীবিনী পাড়ায় পাড়ায় মৎস্য বিক্রয় করিয়া, গোবিন্দের মাতার নিকটে আসিয়া, বিক্রীত মৎস্যের মূল্য চাহিল। গোবিন্দের মাতা তখন মূল্য দিতে পারিলেন না। মৎস্য-জীবিনী ইহাতে গোবিন্দের জননীকে লক্ষ্য করিয়া, নানাপ্রকার কটূতর গালি দিল। গোবিন্দের পিতা এই ব্যাপার অবগত হইয়া, বিলক্ষণ বিরক্ত হইলেন, এবং পুত্রের জন্য ছোট লোকের গালি খাইতে হইল বলিয়া, উদ্দেশে পুত্রকে অনেক তিরস্কার করিলেন। এই ঘটনায় গোবিন্দের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। গোবিন্দ ভোজন হইতে বিরত হইয়া, অর্থ উপার্জ্জন-মানসে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এই সময়ে গোবিন্দের বয়স আট বৎসর।

গোবিন্দ সেই প্রখর মধ্যাহ্ন-কালে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ভাগীরথীর তীরে একটি তাল-বৃক্ষে পক্ষীর কুলায় নিরীক্ষণ করিলেন। পক্ষি-শাবক গ্রহণে লোলুপ

হইয়া, গোবিন্দ সেই বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক বাসায় যেমন হস্ত প্রসারণে উদ্যত হইয়াছেন, অমনি একটি সর্প তাহা হইতে অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্ত হইয়া দংশনে উন্মুখ হইল। অষ্টবর্ষীয় বালক উপস্থিত-বুদ্ধি-বলে বিষধরের গলা এমন বলের সহিত টিপিয়া ধরিলেন যে, সে আর দংশন করিতে পারিল না। সর্প দংশনে অক্ষম হইল বটে, কিন্তু লাঙ্গুল দ্বারা গোবিন্দের হস্ত দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিল। গোবিন্দ এইরূপ বিপন্ন অবস্থায় কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন না, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতির বলে অপর হস্ত দ্বারা লাঙ্গুলের অগ্রভাগ ধরিয়া, এক এক বেড় খুলিতে লাগিলেন, এবং তাহা তালীয় খড়্গ (তালের বাগুরা) দ্বারা ছিন্ন করিয়া, ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে এক জন সন্ন্যাসী সেই তালবৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি বৃক্ষারূঢ় বালকের অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি ও সাহস দেখিয়া তাঁহাকে সঙ্গী করিবার সংকল্প করিলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে গোবিন্দ বিষধরকে বিনষ্ট করিয়া, বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলে, সন্ন্যাসী তাঁহাকে পক্ষিশাবক দিবার লোভ দেখাইয়া, সঙ্গে লইলেন, এবং অনেকস্থান ভ্রমণ করিয়া, দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন।

গোবিন্দ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া, অসাধারণ অধ্যবসায় ও স্বাবলম্বনবলে অল্প সময়ের মধ্যেই আরবী ও

পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেন। তিনি আরবীর সুললিত কবিতাবলি আবৃত্তি করিতে করিতে দিল্লীর রাজপথ দিয়া গমন করিতেন। সম্রাটের প্রধান অমাত্য এই বিষয় অবগত হইয়া, গোবিন্দকে নিকটে আহ্বান করেন। গোবিন্দ উপস্থিত হইলে, দেওয়ান তাঁহার গঠন-সৌন্দর্য্য ও মুখ-শ্রীতে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে বিষয়-কার্য্য শিক্ষা দেন। গোবিন্দ প্রধান অমাত্যের অনুগ্রহে অনেক কার্য্যে নিয়োজিত হন। সমুদয় কার্য্যেই তাঁহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা লক্ষিত হয়। দিল্লীর তাৎকালিক সম্রাট গোবিন্দের কার্য্য-নৈপুণ্যের বিষয় অবগত হইয়া, পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রধান রাজস্ব-সচিবের পদ সমর্পণ করেন। গোবিন্দ এইরূপে বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বাবলম্বন-বলে প্রধান পদে আরূঢ় হইয়া, জনক জননীর নিকট আগমন পূর্ব্বক, তাঁহাদের সন্তোষ বর্দ্ধন করেন, এবং ধর্ম্মপথে থাকিয়া, বিপুল অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হন।

আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জীবনবৃত্তও রাজস্ব-সচিব গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জীবনীর ন্যায় অসাধারণ উন্নতি-জনক ঘটনায় পরিপূর্ণ। বিদ্যা ও বুদ্ধির বলে জগন্নাথ আপনার অবস্থা বিলক্ষণ উন্নত করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র

চক্রবর্ত্তীর ন্যায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননও দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। ইনি ত্রিবেণী গ্রামে ১১০২ সালে (খ্রীঃ ১৬৯৫ অব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। সংস্কৃত শাস্ত্রে রুদ্রদেবের বিশিষ্ট অধিকার ছিল। তিনি সংস্কৃতে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। জগন্নাথের যখন জন্ম হয়, তখন রুদ্রদেবের বয়স ছবট্টি বৎসর হইয়াছিল।

রুদ্রদেব তর্কবাগীশ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। ক্রিয়াকাণ্ডের নিমন্ত্রণ ও শিষ্য যজমান হইতে যাহা লাভ হইত, তাহাদ্বারা কষ্টে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। জগন্নাথের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন রুদ্রদেব তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষায় প্রবর্ত্তিত করেন। জগন্নাথ অসাধারণ স্মৃতিশক্তির বলে পিতার নিকটে মুখে মুখে ব্যাকরণ ও অভিধান শিখিয়া কয়েকখানি সাহিত্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার স্বাবলম্বনশক্তি এতদূর বলবতী ছিল যে, পূর্ব্বে যাহা না পড়া হইয়াছে তাহাও পঠিত পাঠের ন্যায় আবৃত্তি করিতে পারিতেন। জগন্নাথ পিতার নিকটে ব্যাকরণ প্রভৃতি সমাপ্ত করিয়া, জ্যেষ্ঠতাত ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের বংশবাটীর (বাঁশবেড়িয়ার) চতুষ্পাঠীতে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। যখন তাহার বয়স দ্বাদশ বৎসর, তখন তিনি স্মৃতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। স্মৃতির

পর জগন্নাথ ন্যায়শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া, তাহাতেও বিশিষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন।

চব্বিশ বৎসর বয়সে জগন্নাথের পিতৃ-বিয়োগ হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, রুদ্রদেব বড় দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার কিছুরই সংস্থান ছিল না। জগন্নাথ সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন। এই রূপে সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে জগন্নাথের কষ্টের একশেষ হইল। তিনি অপরের নিকট গৃহধর্ম্মের উপযোগী দ্রব্যাদি চাহিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপ দুরবস্থায় পতিত হওয়াতে জগন্নাথকে চতুষ্পাঠীর পড়া ছাড়িয়া, অর্থ উপার্জ্জনের পথ দেখিতে হইল। এই সময়ে তিনি অধ্যাপকের নিকট হইতে "তর্কপঞ্চানন" উপাধি প্রাপ্ত হন।

জগন্নাথ কোন রূপে একটি টোল খুলিয়া, ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অদ্ভুত পাণ্ডিত্য-বলে ক্রমে তাঁহার খ্যাতি চারি দিকে বিস্তৃত হইল, বড় বড় ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র আসিতে লাগিল, অনেক ধর্ম্মপরায়ণ ভূস্বামী তাঁহাকে নিষ্কর ভূমি দিতে লাগিলেন। আপনার বিদ্যা বুদ্ধির প্রসাদে জগন্নাথ ক্রমে অনেক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

সুপণ্ডিত ও সুবিদ্বান্ বলিয়া, জগন্নাথ এরূপ মান-

নীয় ছিলেন যে, অনেক বড় বড় লোক তাঁহাকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। কলিকাতার প্রধান শাসনকর্ত্তা স্যার্ জন্ শোর, প্রধান বিচারপতি স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্স্, বর্দ্ধমানের মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায়, রাজা নবকৃষ্ণ প্রভৃতির নিকটে জগন্নাথের সম্মান ছিল। স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্স্ প্রায়ই সস্ত্রীক, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন *। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রসম্বন্ধে জগন্নাথ যে ব্যবস্থা দিতেন, বিচারপতিগণ তদনুসারে বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। স্যার্ জন্ শোর্ ও স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্স্ প্রভৃতির অনুরোধে জগন্নাথ ব্যবস্থাসংক্রান্ত দুই খানি বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। যাবৎ তিনি এই কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাবৎ মাসিক পাঁচশত টাকা পাইতেন। সঙ্কলনকার্য্য শেষ হইলেও তাঁহার মাসিক তিন শত টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। এই গ্রন্থ সঙ্কলনব্যতীত তিনি আরও কয়েক খানি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন। মুর্ষিদাবাদের নবাব জগন্নাথকে একটি মোহর দিয়াছিলেন।

* একদা স্যার উইলিয়ম্ জোন্স সস্ত্রীক জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে এক জন তাঁহাদিগকে পূজার দালানে বসিতে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্সের পত্নী সংস্কৃতে কহিলেন, "আবাং ম্লেচ্ছৌ" অর্থাৎ আমরা ম্লেচ্ছ, পূজার দালানে বসিবার অধিকারী নহি। ইহার পর তাঁহারা উভয়েই জগন্নাথের অন্তঃপুরে যাইয়া, বিবিধ সদালাপে সকলকে পরিতুষ্ট করেন।

জগন্নাথ আপনার ব্যবস্থাপত্র সকল ঐ মোহরে অঙ্কিত করিতেন।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের অধ্যাপনা-রীতি এরূপ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল যে, নানাস্থান হইতে শিক্ষার্থিগণ আসিয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত। জগন্নাথের অনেক ছাত্রও বড় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ১২১৪ সালে (খ্রীঃ ১৮০৬ অব্দে) ১১১ বৎসর বয়সে, জগন্নাথের মৃত্যু হয়। জগন্নাথ এই সুদীর্ঘ জীবনে সাধারণের নিকটে প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ছোট বড়, ইতর ভদ্র, সকলেই তাঁহার সমাদর করিত। জগন্নাথের স্মৃতি-শক্তি এরূপ বলবতী ছিল যে, তিনি সংস্কৃত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে পারিতেন। জগন্নাথের পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে একটি পিত্তলের জলপাত্র, দশ বিঘা নিষ্কর ভূমি ও তৃণাচ্ছাদিত এক খানি অতিজীর্ণ গৃহ মাত্র ছিল। কিন্তু জগন্নাথ অসাধারণ স্বাবলম্বন ও বিদ্যাবলে নগদ এক লক্ষ টাকা ও বার্ষিক চারি হাজার টাকা উপস্বত্বের নিষ্কর ভূমি রাখিয়া, পরলোকগত হন। অদ্যাপি তাঁহার সন্তানগণ এই সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতে-ছেন।

অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ন্যায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের অসাধারণ ধর্ম্ম-জ্ঞান ছিল। এজন্য সকলেই জগন্নাথকে

দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি করিত। বিদ্যা, ধর্ম্মজ্ঞান ও স্বাবলম্বন একাধারে সমবেত হইলে, মানুষের কেমন উন্নতি হয়, তাহা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জীবনীতে প্রকাশ পাইতেছে।

চরিত্র।

চরিত্র একটি বহুমূল্য সম্পত্তি। অন্য কোন পার্থিব সম্পত্তির সহিত ইহার তুলনা হয় না। সংসারে চরিত্র মানুষকে উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত করিয়া থাকে। পরিশ্রমী, সত্যবাদী, উদার-চেতা এবং সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট ও সাধু ভাব-সম্পন্ন মানব, সমাজের সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিরূঢ় থাকিয়া, সাধারণের হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইয়া থাকেন। সকলেই তাঁহাকে বিশ্বাস করে, এবং সকলেই তাঁহার অনুকরণে ব্যগ্র হয়। পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর, সুখপ্রদ ও উৎকৃষ্ট, তিনি তাহারই অধিকারী হন। তাঁহার অবর্ত্তমানে পৃথিবী অসার ও অপদার্থ হইয়া পড়ে। এই পরিশ্রম, সত্যবাদিতা, সাধুতা, উদারতা ও সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ, চরিত্রগুণেই বর্দ্ধিত হয়।

প্রতিভাশালী ব্যক্তি লোকের নিকটে কেবল প্রশংসা প্রাপ্ত হন, কিন্তু সচ্চরিত্র ব্যক্তি প্রশংসার

সহিত, সমাদর ও সম্মান এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইয়া থাকেন। প্রতিভা মস্তিষ্কের শক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়, চরিত্র হৃদয়ের শক্তি বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। যাহার হৃদয় যে ভাবে পূর্ণ হয়, সে সংসারে তদনুরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, জীবন অতিবাহিত করে। এইরূপে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি যখন সমাজে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনে সযত্ন হন, চরিত্র-সম্পন্ন ব্যক্তি তখন সমাজে ধর্ম্মভাবের উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট থাকেন। সমাজ একজনের সুখ্যাতি করে, অপর জনের অনুকরণে ব্যগ্র থাকে।

মহৎ ব্যক্তি সংসারে দুর্লভ। জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে অতি অল্প লোকেই মহত্ত্ব লাভের সুযোগ পান। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিই সাধ্যানুসারে সাধুতা ও সম্মানের সহিত আপনার কার্য্য সাধন করিতে পারেন। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহাকে যে সমস্ত বিষয় দিয়াছেন, তিনি তৎসমুদয়ের যথাযোগ্য ব্যবহারে সমর্থ হইতে পারেন। তিনি তাঁহার জীবন সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে পারেন এবং সত্যবাদী, সাধু, বিশ্বাসী ও সুব্যবস্থিত হইতে পারেন। সংক্ষেপে ঐশীশক্তি তাঁহাকে যে অবস্থায় স্থাপিত করিয়াছে, তিনি সেই অবস্থায় থাকিয়াই, স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন।

কেবল জ্ঞানানুশীলনের সহিত চরিত্রের পবিত্রতার

তাদৃশ নিকট সম্বন্ধ নাই। তাই বলিয়া বিদ্যা-চর্চ্চায় অবহেলা করা বিধেয় নহে। বিদ্যার সহিত সাধুতার সংযোগ থাকা আবশ্যক। কোন কোন সময়ে বিদ্যার সহিত অপকৃষ্ট চরিত্রের সম্মিলন দৃষ্ট হয়। এক ব্যক্তি সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পে সুপণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু সাধুতা, ধর্ম্মশীলতা, সত্যবাদিতা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় তিনি নিরক্ষর ও দরিদ্র কৃষকগণ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া থাকেন। কোন সুপণ্ডিত ও সুলেখক কহিয়াছেন, "আমি অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছি, অনেক জ্ঞানী লোক দেখিয়াছি, অনেক প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছি; কিন্তু অশিক্ষিত পুরুষ ও রমণীগণ আমার নিকটে যে সকল মত ব্যক্ত করিয়াছে, তাহা পুস্তকাদির মত অপেক্ষাও উচ্চতর। আমরা যাবৎ সমুদায় পদার্থই চন্দ্রালোকের ন্যায় নির্ম্মল ও অনবদ্য দেখিতে অভ্যাস না করিব, তাবৎ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হইব না।"

বিদ্যা অপেক্ষা ধনের সহিত চরিত্রের উন্নতির আরও দূরতর সম্বন্ধ। ধন অনেক সময়ে চরিত্র দূষিত ও অপকৃষ্ট করিয়া থাকে। অর্থ, ভোগাসক্তি, অপকর্ষ ও পাপ পরস্পর ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ। অর্থ যদি হীনবুদ্ধি, আত্মশাসনাক্ষম ও ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে উহা নানা অনর্থের মূল হইয়া উঠে।

পক্ষান্তরে দরিদ্রাবস্থার সহিত চরিত্রের অপেক্ষাকৃত নিকট সম্বন্ধ আছে। লোকে নিজের পরিশ্রম, মিত-ব্যয়িতা ও সদাচারের উপর নির্ভর করিয়া চলিলে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখাইতে সক্ষম হয়। একটি জ্ঞানী লোক তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—"যদিও তোমার একটি কপর্দ্দকও সম্বল নাই, তথাপি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে বিমুখ হইও না; যেহেতু হৃদয় সাধু ও মনুষ্যোচিত না হইলে কেহই সম্মানিত হয় না।" এক ব্যক্তি সমস্ত দিন পরি-শ্রম করিয়া, আপনার পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি যদিও বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষালাভ করেন নাই, তথাপি বিলক্ষণ জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ছিলেন। তাঁহার পুস্তকালয়ে একখানি ধর্ম্মপুস্তক ও কয়েকখানি সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তাঁহার আয়ও যৎসামান্য ছিল। এই মহাশয় ব্যক্তি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সৎপ্রকৃতি ও সদ্ব্যবহারের বলে এরূপ খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন যে, তাহা অনেক ধনবান্ ও মহৎ ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

চেষ্টা ব্যতিরেকে চরিত্র উন্নত ও উচ্চভাবে পূর্ণ হয় না। চরিত্রের উন্নতি জন্য, আত্মপর্য্যবেক্ষণ, আত্ম-শৃঙ্খলা ও আত্মশাসন থাকা বিশেষ আবশ্যক। পৃথি-বীর চারিদিকেই পাপ লোকের অমঙ্গলের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে, চারিদিকেই প্রলোভনসামগ্রী বিস্তৃত আছে।

এই পাপ ও প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, চরিত্র উন্নত করিতে হইলে, আত্মপর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির আবশ্যকতা অনুভূত হয়। যাহা পাপজনক ও যাহা অকর্ত্তব্য, তাহা চিরকাল ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করা উচিত। আত্মপর্য্যবেক্ষণ ও আত্ম-শৃঙ্খলা না থাকিলে, পাপ হইতে দূরে থাকিয়া, সৎপথ অবলম্বন করা যায় না। আত্মশাসন সকল ধর্ম্মের মূল। আত্মশাসনক্ষমতা না থাকিলে, মানুষ প্রায়ই কুপথে পদার্পণ করিয়া চরিত্র দূষিত করে; যখন কোন অকার্য্যের অনুষ্ঠানে ইচ্ছা জন্মে, তখন আত্মশাসন-বলে সেই ইচ্ছা সংযত করা কর্ত্তব্য। বাল্যশিক্ষা ও সৎসংসর্গের উপর চরিত্রের উন্নতি ও অবনতি অধিকাংশে নির্ভর করে। আত্মশাসন দ্বারা আপনাকে অসৎ-বিষয়-শিক্ষা ও অসৎসংসর্গ হইতে বিরত রাখা বিধেয়।

আত্মপর্য্যবেক্ষণ, আত্মশৃঙ্খলা ও আত্মশাসনের সহিত সুশিক্ষা ও সদ্দৃষ্টান্তের সংযোগ থাকা উচিত। সুশিক্ষায় অন্তঃকরণ মার্জ্জিত হয়, হৃদয় প্রশস্ত হয়, এবং কর্ত্তব্য-জ্ঞান অটল হইয়া থাকে। সদ্দৃষ্টান্তেও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে ইচ্ছা জন্মে। চরিত্র ক্রমে ক্রমে এই সুশিক্ষা, সদ্দৃষ্টান্ত ও আত্মপর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতিতে উন্নত ও পবিত্র হইয়া উঠে।

উন্নত চরিত্রের লোক সংসারের অলঙ্কার স্বরূপ।

অনেকে কেবল চরিত্রের গুণেই সামান্য অবস্থা হইতে ধনে ও মানে অদ্বিতীয় লোক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রধান ধনী রামদুলাল দের জীবনবৃত্ত ইতিহাসের বর্ণনীয় বিষয় হইয়া রহিয়াছে। রামদুলাল কেবল চরিত্রের গুণে মাসিক দশ টাকা বেতনের সামান্য সরকারী হইতে কোটীপতি হইয়াছিলেন। দমদমার সমীপবর্ত্তী রেকজানি-নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে রামদুলালের জন্ম হয়। রামদুলালের পিতার নাম বলরাম সরকার। বলরাম বড় দরিদ্র ছিলেন। খড় বিক্রয় ও সামান্য গুরুমহাশয়গিরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। শৈশবকালেই রামদুলাল পিতৃ-মাতৃ-হীন হন; এজন্য তাঁহার ভরণপোষণের ভার মাতামহের উপর পড়ে। রামদুলালের মাতামহী কলিকাতা-নিবাসী মদনমোহন দত্তের অন্তঃপুরে পাচিকার কর্ম্ম করিতেন। ক্রমে রামদুলাল মদনমোহনের পরিবার-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যৎসামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করেন। মদনমোহন সে সময়ে ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। রামদুলাল ষোল বৎসর বয়সে মদনমোহন দত্তের অনুগ্রহে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে বিল-সরকার হন। এই সামান্য কর্ম্ম করিয়া, তিনি বৃদ্ধ মাতামহের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। রামদুলালের সৎস্বভাব ও

কার্য্য-নৈপুণ্য দেখিয়া, মদনমোহন তাঁহাকে দশ টাকা বেতনের সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই কার্য্যে রামদুলালকে প্রতিদিন জাহাজে যাইয়া, বাণিজ্য-দ্রব্যাদি দেখিতে হইত। এক দিন রামদুলাল আপনার কার্য্য করিতে যাইয়া, ভাগীরথীতে একখানি জাহাজ জলমগ্ন দেখিতে পান। ঐ জাহাজ দেখিয়াই তিনি উহাতে কি পরিমাণে দ্রব্য আছে, এবং উহার মূল্য কত হইবে, নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার কিছু দিন পরে মদনমোহন দত্ত একটি নির্দ্দিষ্ট নীলাম ক্রয় করিতে রামদুলালকে কোন আফিসে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু রামদুলালের যাইবার পূর্ব্বেই সেই নীলাম বিক্রীত হইয়া যায়। রামদুলাল যাইয়া শুনিলেন, একখানি জাহাজ নীলামে ধরা হইয়াছে। উহাই যে, তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট জাহাজ, তাহা রামদুলালের স্পষ্ট অনুমিত হইল। সুতরাং রামদুলাল মদনমোহনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই ১৪,০০০ টাকা দিয়া, ঐ জাহাজ ক্রয় করিলেন। জাহাজ বিক্রীত হইলে, এক জন সাহেব নীলামস্থলে উপস্থিত হইলেন। ঐ জাহাজ ক্রয় করিতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। নিজের অভীষ্ট দ্রব্য একজন সামান্য সরকারের হস্তগত হইয়াছে শুনিয়া, সাহেব রামদুলালের নিকটে জাহাজ চাহিলেন। কিন্তু রামদুলাল

ক্রীত দ্রব্য ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে অনেক তর্কবিতর্কের পর রামদুলাল এক লক্ষ টাকা লইয়া, জাহাজখানি সাহেবের নিকটে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। ন্যায়ানুসারে এই লক্ষ টাকা মদন-মোহনের প্রাপ্য। রামদুলাল ইচ্ছা করিলেই লাভাংশ আত্মসাৎ করিয়া প্রভুর সমস্ত টাকা ফিরাইয়া দিতে পারিতেন। মদনমোহন ইহার কিছুই অবগত ছিলেন না, সুতরাং রামদুলালের কিছুই করিতে পারিতেন না। কিন্তু রামদুলালের চরিত্র পবিত্র ও উন্নত ছিল। তিনি আত্মশাসন-বলে এই পাপজনক কার্য্য হইতে বিরত হইলেন। অধিকন্তু প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে জাহাজ কিনিয়াছেন বলিয়া, রামদুলাল নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। এইরূপ শঙ্কিত হৃদয়ে তিনি মদনমোহন দত্তের নিকটে এক লক্ষ টাকা রাখিয়া, ঘট-নার আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন।

মদনমোহন অর্থ-গৃধ্নু ও অনুদার ছিলেন না। তিনি সমস্ত বিবরণ শুনিয়া, ঐ টাকা গ্রহণ করিলেন না। এক লক্ষ টাকা রামদুলালকে তাঁহার পবিত্র চরিত্রের পুরস্কার স্বরূপ দান করিলেন। রামদুলাল এই লক্ষ টাকা লইয়া, বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হন এবং আপনার পরিশ্রম, সৎস্বভাব ও কার্য্যনৈপুণ্যে অদ্বিতীয় ধনী হইয়া উঠেন। ৭৩ বৎসর বয়সে রামদুলালের পর-

লোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার এত সম্পত্তি ছিল যে, লোকে তাঁহাকে ধন-কুবের বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। অনেক সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও স্বদেশীয়ের নিকটে রামদুলালের বিলক্ষণ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। কেবল চরিত্র-গুণেই রামদুলাল এইরূপ বিপুল অর্থ উপার্জ্জন ও প্রভূত সম্মানলাভ করিয়াছিলেন।

মানস সরোবর।

আমাদের দেশের অনেকের মুখেই মানস সরোবরের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। সাহিত্য-সংসারে এই সরোবর বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত ও বাঙ্গালার কবিগণ প্রায়ই ইহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মানস সরোবর যেমন কবিতাদেবীর প্রিয়তম বিষয়, তেমন পুণ্যসঞ্চয়েরও প্রধান উপায়। হিন্দু ও তিব্বৎদেশীয়দিগের মতে মানস সরোবর দর্শন ও বেষ্টন করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়।

মানস সরোবর প্রকৃতির যুগপৎ ভীষণ ও রমণীয় প্রদেশে অবস্থিত। ইহার প্রায় চারি দিক্ই পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। দক্ষিণে অত্যুচ্চ হিমালয় ইহার তটদেশে তুষাররাশি প্রক্ষেপ করিতেছে, পূর্ব্বে ধবল-কায় কৈলাস গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং উত্তরে ও পশ্চিমে উন্নত ভূখণ্ড, পর্ব্বত, গিরি-

সঙ্কট প্রভৃতির আকারে অবস্থিতি করিতেছে। এই সরোবরের আকার আয়ত ক্ষেত্রের ন্যায়। ইহার নিকটে বৃক্ষসমাকীর্ণ বনভূমি নাই, কেবল শুষ্ক তৃণ-গুল্মাদি বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। হ্রদের তটদেশের ভূমি শুষ্ক ও দৃঢ়; কোন পল্বল বা কর্দ্দমময় স্থান নাই। জল স্বচ্ছ ও স্বাদু। জলের মধ্যে কোন প্রকার পানা অথবা তৃণপ্রভৃতি দেখা যায় না, কেবল জলের নিম্নে ঘাস জন্মিয়া, তরঙ্গবেগে তীরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। মানসে সুবর্ণ-নলিনীর আবির্ভাব কেবল কবি-কল্পনামাত্র।

মানস সরোবরের পরিধি পঞ্চাশ মাইল। ইহা চারি দিনে বেষ্টন করা যায়। কেহ কেহ কহেন, তীর্থ-যাত্রিগণ পাঁচ ছয় দিনে ইহার চারি দিক্ ঘুরিয়া আইসে। এই সরোবরে অনেক মৎস্য পাওয়া যায়। পবিত্র স্থানের মৎস্য বলিয়া, স্থানীয় লোকে উহা ভোজন করে না। প্রবল বাত্যাবেগে সরোবরে সময়ে সময়ে ভীষণ তরঙ্গ উত্থিত হয়। তরঙ্গের আঘাতে জলস্থিত মৎস্য সকল তীরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে হংস প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষী এই সরোবরের নিকটে বাস করে, কিন্তু শীতকাল উপস্থিত হইলেই উহারা ভারত-বর্ষে চলিয়া যায়। এই জন্যই বোধ হয়, আমাদের দেশের কবিগণ কহিয়া থাকেন, বর্ষাসমাগমে হংস সকল মানস [illegible] করে।

কার্ত্তিক মাসে এই হ্রদের কিনারার জল জমিতে থাকে। কিন্তু বায়ুর প্রবল বেগ-প্রযুক্ত অগ্রহায়ণ মাস শেষ না হইলে, উপরিভাগের সমস্ত জল জমে না। পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে সমুদয় সরোবর-তল কঠিন তুষারময় হইয়া যায়। এই সময়ে গবাদি পশু হাঁটিয়া মানস সরোবর পার হইয়া থাকে। চৈত্র মাসে কঠিন বরফ-রাশি ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়; বৈশাখে ভগ্ন বরফ-খণ্ড হ্রদের ইতস্ততঃ ভাসিতে থাকে। ইহার পর জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে সমস্ত হ্রদ পুনর্ব্বার জলময় হইয়া যায়।

পুরাণের মতে শতদ্রু নদী মানস সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে মানস সরোবর শতদ্রুর উৎপত্তি-স্থান নহে। ইহাঁরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, রাবণ হ্রদ (নামান্তর লঙ্কা, লঙ্কেস অথবা লঙ্কাচো) হইতে শতদ্রুর উৎপত্তি হইয়াছে। যাহা হউক, মানস সরোবরের সহিত কোন নদীর সংযোগ আছে কি না, তদ্বিষয়ে অনেকেই অনুসন্ধান করিয়াছেন। মুরক্রফট্ নামক এক জন ভ্রমণকারী কোন নদী দেখিতে পান নাই; কিন্তু তিনি শুনিয়াছেন, পূর্ব্বে মানস সরোবরের সহিত রাবণ হ্রদের সংযোগ ছিল। গেরার্ড নামক অন্য এক জন ভ্রমণকারী অবগত হইয়াছেন যে, বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে একটি বেগবতী

স্রোতস্বতী দ্বারা মানস সরোবরের সহিত রাবণ হ্রদের সংযোগ ছিল। পার হইবার জন্য ঐ নদীর উপরে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন উক্ত নদী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তিব্বৎ দেশের যে সকল লোক মানস সরোবরের তটে বাস করে, তাহাদের বিশ্বাস, ভূগর্ভ দিয়া এই হ্রদের সহিত কোন জলপথের সংযোগ আছে। চীনদেশের এক জন রাজপুরুষ কহিয়াছেন, পূর্ব্বে একশতটি নদী এই সরোবরে পতিত হইত, উহাদের একটি দ্বারা মানস সরোবরের সহিত রাবণ হ্রদের সংযোগ ছিল, এখন ঐ নদী শুকাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মানস সরোবরের জল সুস্বাদ ও স্বচ্ছ। কোনরূপ নদীর সহিত সংযোগ না থাকিলে, জলাশয়ের জল এমন স্বাদু ও স্বচ্ছ হয় না। বদ্ধজল হ্রদের বারি প্রায়ই লবণাক্ত ও বিস্বাদ হইয়া থাকে। এই জন্য অনেকে অনুমান করেন যে, ভূগর্ভ দিয়াই হউক, অথবা ভূপৃষ্ঠদিয়াই হউক, মানস সরোবরের সহিত কোন জলপথের সংস্রব আছে। চারি দিকে পর্ব্বতমালা বর্ত্তমান থাকাতে, কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, রাবণ হ্রদের ন্যায় মানস সরোবরেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পতিত হয়। গ্রীষ্মকালে বহুসংখ্য ক্ষুদ্র নদী রাবণ হ্রদ হইতে বহির্গত হয়। কথিত আছে, উহাদের একটি মানস সরোবরের সহিত মিলিত হইয়া থাকে।

সকলেই মানস সরোবরের জোয়ার ভাটার পরিমাণ করিয়াছেন। কোন প্রকার জলপথ না থাকিলে জোয়ার ভাটার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। সুতরাং সরোবর-জলের এই হ্রাস-বৃদ্ধিও জলপথের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে একটি প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

ভারতবর্ষের চারিটি প্রধান নদ ও নদী (সিন্ধু, শতদ্রু, ব্রহ্মপুত্র ও সরযূ) মানস সরোবরের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে নির্গত হইয়াছে। সুতরাং এই স্থানের উচ্চতা অধিক। সমুদ্রতল হইতে মানস সরোবর অনূ্যন ১৭,০০০ ফীট উচ্চ। লামা ও সংসার-পরিত্যাগী তপস্বিগণ সমস্ত বৎসর এই সরোরের তটে বাস করে। যাত্রিগণ ইহাদিগকে যাহা কিছু দেয়, তাহাতেই ইহাঁদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হয়। মানস সরোবরের উচ্চতা ধরিলে, বোধ হইবে, পৃথিবীতে মানব জাতির অধ্যুষিত যত স্থান আছে, তাহার মধ্যে এই তটভূমিই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত।

ভিন্ন দেশের অনেক গ্রন্থকার ও পর্য্যটক মানস সরোবরের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। মোগল সম্রাট্ আকবর শাহ যখন কাবুলে যাত্রা করেন, তখন এক জন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। ইনি তীর্থ-যাত্রিদের নিকট হইতে যে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, মানস সরোবর

সর্হিন্দের প্রায় ৩৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। ইউ-রোপীয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে পিআণ্ড্রাডা নামক এক ব্যক্তি ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে এই সরোবর দর্শন করেন। তাতারদেশীয়দিগের মধ্যে মানস সরোবর "মেপাঙ্গচো" নামে প্রসিদ্ধ।

মানস সরোবরের দৃশ্য অতি রমণীয়, মনোহর ও গভীর ভাবের উত্তেজক। ইহার যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, সেই দিকেই দেখিবে, সুবিস্তৃত ও সমুন্নত পর্ব্বত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মধ্যভাগে সুবিস্তীর্ণ স্বচ্ছ সরোবর। সরোবরের জল রাশির মধ্যভাগ হরিদ্বর্ণ। হংসকুল এই হরিদ্বর্ণ জলরাশির মধ্যে মৃদুপবন-সঞ্চালিত তরঙ্গাবলীর সহিত নাচিয়া বেড়ায়। সময়ে সময়ে ঐ ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা প্রবল বায়ুবেগে ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে। নিসর্গরাজ্যের এই ভীষণ ও রমণীয় শোভা নয়নের অনির্ব্বচনীয় প্রীতিকর। এইরূপ আলেখ্যবৎ-রমণীয়তা ও এইরূপ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবশতঃ সুকবির রসময়ী লেখনী হইতে মানস সরোবরের গৌরবকাহিনী নিঃসৃত হইয়াছে।

প্রতাপ সিংহ।

প্রতাপ সিংহ মিবারের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মিবারের রাজবংশীয়দিগের সাধারণ উপাধি 'রাণা'। রাণাগণ সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত। ইহাঁরা কহিয়া থাকেন, রামচন্দ্রের পুত্র লব, ইহাঁদের বংশের আদি-পুরুষ। লব পঞ্জাবে লবকোট (আধুনিক লাহোর) নামে একটি নগর স্থাপন করেন। এই লবকোট বা লাহোরই রাণাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি নিবাস-ভূমি। লবের বংশধরগণ বহুকাল লাহোরে অবস্থিতি করেন, পরে ইহাঁদের অধিনেতা কনকসেন ১৪০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর হইতে দ্বারকায় যাইয়া বাস করিতে থাকেন। ক্রমে কনকসেনের বংশীয়গণ বল্লভীপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। কালক্রমে অসভ্য জাতির আক্রমণে বল্লভীপুর-রাজ বিনষ্ট হন, রাণীগণ ভর্ত্তার সহিত চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। কেবল অন্ত-তমা রাণী পুষ্পবতী, ঘটনাক্রমে স্থানান্তরে থাকাতে ঐ ভীষণ বিপ্লব হইতে রক্ষা পান। জৈনদিগের গ্রন্থা-নুসারে ঐ বিপ্লব ৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

বল্লভীপুর-ধ্বংসের সময় পুষ্পবতী গর্ব্ভবতী ছিলেন। বল্লভীপুরের শোচনীয় সংবাদ পাইয়া, তিনি একটি

পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গুহায় তাঁহার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। পুষ্পবতী, কমলাবতী নামে একটি ব্রাহ্মণ-জায়ার হস্তে তনয়ের রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া, ভর্ত্তার উদ্দেশে চিতাধিরোহণ করেন। গুহায় জন্ম হওয়াতে, পুষ্পবতী-তনয় গুহ নামে অভিহিত হন। কালক্রমে গুহ পার্ব্বত্য প্রদেশের ভিলদিগের অধিনায়ক হইয়া উঠেন। এই গুহ হইতে গোহিলোট (সাধারণতঃ গিহ্লোট) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

গুহের সন্তানগণ অষ্টম পুরুষ পর্য্যন্ত এই পার্ব্বত্য প্রদেশে আধিপত্য করেন। অষ্টম ভূপতির নাম নাগাদিত্য। একদা অসভ্য ভিলগণ বিদেশীয় রাজার শাসনে উত্ত্যক্ত হইয়া নাগাদিত্যের প্রাণ সংহার করে। নাগাদিত্যের বাপ্পা নামে তিন বৎসর-বয়স্ক একটি পুত্রসন্তান ছিল। এক জন ভিল দয়াপরবশ হইয়া, তাহাকে ভাণ্ডিয়ার দুর্গে আনিয়া রক্ষা করে। ভাণ্ডিয়ার হইতে বাপ্পা অধিকতর নিরাপদস্থল পরাশর অরণ্যে আনীত হন। এই অরণ্যের নিকটেই ত্রিকূট পর্ব্বত রহিয়াছে। পর্ব্বতের পাদদেশে নগেন্দ্র নগর অবস্থিত। নগেন্দ্র নগর ব্রাহ্মণসম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণগণ এই স্থলে বেদগানে ও বেদোচিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সমস্ত সময় যাপন

করিতেন। এই পর্ব্বত-পাদদেশে—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আশ্রয়-ক্ষেত্রে বাপ্পার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।

এই সময়ে চিতোর রাজ্য প্রমরবংশীয় মোরি ভূপতিদিগের শাসনাধীন ছিল। গুহের জননী পুঁষ্প-বতী প্রমরবংশীয় চন্দ্রবতীরাজের দুহিতা। গুহের বংশে বাপ্পা রাওর জন্ম, সুতরাং বাপ্পার সহিত প্রমর-বংশের সম্বন্ধ ছিল। এই সম্বন্ধের বিষয় অবগত হইয়া, বাপ্পা চিতোরে উপস্থিত হন। চিতোরের তদানীন্তন নৃপতি বাপ্পাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাপ্পা এইরূপে চিতোরের সেনা-পতি হইয়া কিছুকাল যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। যুদ্ধে তাঁহার অসাধারণ বিক্রম প্রকাশিত হয়। কালক্রমে মোরি-কুলের পতন হয়। বাপ্পা ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতো-রের সিংহাসন গ্রহণ করেন। কথিত আছে, যখন বাপ্পারাও চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স পনর বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

এই বাপ্পারাও চিতোরে গোহিলোট বংশের প্রথম রাজা এবং এই বাপ্পারাও "হিন্দু-সূর্য্য" বলিয়া রাজস্থানে সম্মানিত। চিতোর-ভূমি যে বীরকুলধাত্রী ও বীরকুল-প্রসবিনী হইয়া লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারিণী হইয়াছে, এই বাপ্পারাওই তাহার মূল। বাপ্পারাওর বংশ-ধরগণ অনেকবার যবনের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিলেন,

এবং অনেকবার যবনদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। যখন পানিপথে লোদীবংশের পতন ও মোগলবংশের অভ্যুদয় হয়, তখন বাপ্পারাওর সন্তানগণ মিবারে সবিশেষ পরাক্রমশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই প্রসিদ্ধ বংশে রাণা সংগ্রাম সিংহের জন্ম হয়। রাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্রের নাম উদয় সিংহ। সংগ্রাম সিংহ পুত্রের মুখ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই; উদয় সিংহের ভুমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয় *। যাহা হউক, উদয় সিংহের বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। উদয় সিংহ স্নেহময়ী ধাত্রী ও এক জন বিশ্বস্ত নাপিতের কৌশলে ঐ সঙ্কট হইতে, মুক্তি লাভ করেন †। রাণা সংগ্রাম সিংহের

* কথিত আছে, সংগ্রাম সিংহ সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে রাজমন্ত্রিগণ বিরক্ত হইয়া, বিষপ্রয়োগে তাঁহার প্রাণ নাশ করেন।

† বনবীর সংগ্রাম সিংহের ভ্রাতা পৃথ্বীরাজের পুত্র। একটি দাসীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। উদয় সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বনবীরের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পিত হয়। কিন্তু রাজ্যলোলুপ বনবীর দীর্ঘকাল আপনার রাজত্ব অব্যাহত রাখিবার জন্য, উদয় সিংহকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। একদা রাত্রিকালে উদয় সিংহ আহার করিয়া নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে এক জন নাপিত উদয় সিংহের ধাত্রীকে এই ভয়ানক সংবাদ জানায়। ধাত্রী তৎক্ষণাৎ একটি ফলের চাঙ্গারির মধ্যে নিদ্রিত উদয় সিংহকে রাখিয়া এবং উহার উপরিভাগ পত্রাদিতে আচ্ছাদন করিয়া, নাপিতের হস্তে সমর্পণ করে। বিশ্বস্ত নাপিত সেই চাঙ্গারি লইয়া, নিরাপদ স্থানে যায়। এমন সময়ে বনবীর অসিহস্তে সেই গৃহে আসিয়া, ধাত্রীর নিকটে উদয় সিংহের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ধাত্রী বাঙ-নিষ্পত্তি না করিয়া স্বীয় নিদ্রিত পুত্রের প্রতি অঙ্গুলি প্রসারণ করে। বনবীর উদয় সিংহবোধে সেই ধাত্রী-পুত্রেরই প্রাণ সংহার করিয়া চলিয়া যান। এদিকে রাজবংশীয় কামিনীগণের

সন্তানের জন্য রাজপুতধাত্রীর এই কৌশল জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। যে চিতোরের জন্য, বাপ্পারাওর বংশ রক্ষার নিমিত্ত, অবলীলাক্রমে স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন ও প্রীতির একমাত্র পুত্তলী শিশু সন্তানকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ করে, তাহার স্বার্থত্যাগ কত দূর উচ্চ ভাবের পরিচায়ক! যে স্বদেশের গৌরবরক্ষার্থ হৃদয়-রঞ্জন কুসুমকলিকাকে বৃন্তচ্যুত দেখিয়াও আপনার কর্ত্তব্যসাধনে পারাঙ্মুখ না হয়, তাহার হৃদয় কত দূর তেজস্বিতা ও কতদূর স্বদেশহিতৈষিতার পরি-পোষক! প্রকৃত তেজস্বী ও প্রকৃত দেশহিতৈষী ব্যতীত অন্য কেহ এই তেজস্বিনী নারীর হৃদয়গত মহান্ ভাব বুঝিতে পারিবেন না। ভীরু প্রকৃতি, ধাত্রীকে রাক্ষসী বলিয়া ঘৃণা করিতে পারে, কিন্তু তেজস্বিনী প্রকৃতি তাহাকে মূর্ত্তিমতী হিতৈষিতা বলিয়া, চিরকাল যত্নের সহিত হৃদয়ে রক্ষা করিবে। ফলে ধাত্রীর নিঃস্বার্থ হিতৈষণা তাহার রাক্ষসী ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সাধারণে এমন অসা-ধারণ ভাব মনেও ধারণা করিতে পারে না। যাবৎ হিতৈষণা ও তেজস্বিতার সম্মান থাকিবে, তাবৎ এই

রোদনধ্বনির মধ্যে ধাত্রীপুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ধাত্রী নীরবে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বীয় শিশুসন্তানের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দেখিয়া, নাপিতেরনিকটে গমন করে। এই ধাত্রীর নাম পান্না।

স্বার্থত্যাগ ও তেজস্বিনী পান্নার নাম কখনও ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইবে না।

চিতোর হইতে পলায়নের পর উদয় সিংহ বহুকাল পান্নার তত্ত্বাবধানে দেশান্তরে রক্ষিত হন। কালক্রমে মিবারের সর্দ্দারগণ উদয় সিংহকেই চিতোরের বিধি-সঙ্গত রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। উদয় সিংহের অনুকুলে মিবারের প্রধান প্রধান লোক সমবেত হইয়া, যুদ্ধ উপস্থিত করাতে বনবীর চিতোর পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইতে অনুমত হন। সুতরাং, উক্ত রাজ্য উদয় সিংহের অধীন হয়। এইরূপে সুপ্রসিদ্ধ সূর্য্য-বংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক, বহুকাল দেশান্তরে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া, উদয় সিংহ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে বাপ্পা রাওর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজ্য প্রাপ্তির কিছু পূর্ব্বে তিনি ঝালোরের সর্দ্দারের দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। এই দম্পতীই প্রতাপ সিংহের জননী ও জনক।

প্রতাপ সিংহ কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, রাজ-স্থানের ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ নাই। তবে তাঁহার সমকালে রাজস্থানের বড় শোচনীয় দশা উপ-স্থিত হয়, মোগলদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণই এই দশা-বিপর্য্যয়ের একমাত্র কারণ। এই আক্রমণের সময় ধরিলে প্রতীত হইবে, প্রতাপ সিংহ খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর

শেষে ভূমিষ্ঠ হন। যাহা হউক, যে সময়ে প্রতাপসিংহ বাপ্পা রাওর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, সে সময়ে বীর-প্রসবিনী চিতোর-ভূমি কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা বর্ণিত হইতেছে।

রাজস্থানের প্রসিদ্ধ কবি চাঁদ বর্দ্দে কহিয়াছেন, "যে স্থানে বালক রাজত্ব করে, কিংবা স্ত্রীলোক শাসন-কার্য্য চালায়, সে স্থানকে ধিক্! যে স্থলে এই উভয়ের সমাবেশ হয়, সে স্থলের দুর্দ্দশার আর ইয়ত্তা থাকে না।" চিতোররাজ উদয়সিংহ এই বালক ও নারী, উভয়েরই প্রকৃতি ও ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যে তেজস্বিতা ও বীরত্বের আধার ছিলেন, সেই তেজস্বিতা ও বীরত্বে উদয় সিংহের প্রকৃতি সমুন্নত হয় নাই। উদয় সিংহ প্রকৃতপক্ষে নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষ ছিলেন। প্রতাপ সিংহের পিতার এরূপ নিস্তেজ নারী-প্রকৃতি বীরভূমি চিতোরের ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সময়ে আকবরের ন্যায় এক জন সুযোদ্ধা ও দিগ্বিজয়-পটু সম্রাট্ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না থাকিলে, উদয় সিংহ চিতোরে সংযত-চিত্ত তপস্বীর ন্যায় কালাতিপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতা উদয় সিংহের অদৃষ্টে সেরূপ শান্তি লিখেন নাই। সুতরাং চিতোরে থাকিয়া তিনি শান্তিসুখের অধিকারী হইতে পারিলেন না। এই সুখ

লাভের আশায় তাঁহাকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইল। তবে কি রাজপুতের হৃদয় বিকৃত ও রাজ-পুতনা পূর্ব্ব-গৌরবভ্রষ্ট? রাজস্থানের থর্ম্মাপলি* ও কাঙ্গ্রা (দুর্গ-প্রাচীর) তবে কি অলীক? ইতিহাসের অনুসরণ কর, এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাইবে।

যে বৎসর উদয় সিংহের রাজ্য-প্রাপ্তিতে কমল-মীরের† প্রাসাদ হইতে আনন্দ-কোলাহল সমুত্থিত হয়, সেই বৎসরই ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে অমরকোটে একটি বালক জন্মগ্রহণ করে। কমলমীরের আনন্দস্বর সমস্ত মিবারে পরিব্যাপ্ত হয়, অমরকোটের শোক-স্বর বৃক্ষ-লতাশূন্য বিজন মরুভূমির বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। উদয় সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করাতে, কমলমীরের জনগণ সমবেত ব্যক্তিদিগকে মুক্তহস্তে ধন দান করে; অমরকোটের বালক জন্মগ্রহণ করাতে, তাহার পিতা অন্য সম্পত্তির অভাবে একটি সামান্য কস্তুরী খণ্ড খণ্ড করিয়া, সমবেত বন্ধু-জনের মধ্যে বিতরণ করেন। এক সময়ে চিতোরের উদয় সিংহের সহিত অমরকোটের বালকের এইরূপ প্রভেদ ছিল, এক সময়ে একের

* থর্ম্মাপলি গ্রীস দেশের একটি প্রসিদ্ধ গিরি-সঙ্কট। এই স্থানে গ্রীক সেনাপতি লিওনিদস্ স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার্থ পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া, প্রাণ বিবর্জ্জন করেন। হল্‌দিঘাট রাজস্থানের থর্ম্মাপলি।

† কমলমীরের প্রকৃত নাম কুম্ভমেরু। মিবারের রাণাকুম্ভ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

সিংহাসনাধিরোহণ ও অপরের জন্মগ্রহণ এইরূপ বিসদৃশ ঘটনায় সুচিত হইয়াছিল। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল সময়ের সহিত পরিশেষে এই মরু-প্রান্তবর্ত্তী বালকের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হয়। কালে এই বালকের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ হিমালয় হইতে সুদূর কুমারিকা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া পড়ে, এবং কালে এই বালকের উদ্দেশে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনি উত্থিত হইয়া, সুদূর গগনতলে বিলীন হয়।

এই বালকের নাম আকবর। হুমায়ুন যখন রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট হইয়া দেশান্তরে পলায়িত, তখন বিস্তীর্ণ ভারত-মরুর এক খণ্ড ওয়েসিসে ভারতের এই ভাবী সম্রাট ভূমিষ্ঠ হন। হুমায়ুন যেরূপে রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া দুরবস্থায় পড়েন, তাহা ইতিহাসে সবিশেষ বর্ণিত আছে। এস্থলে তদ্বিষয় উল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই; কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পুত্রের জন্ম-সময়ে হুমায়ুনের ললাট হইতে রাজটীকা বিচ্যুত হইয়াছিল, হস্ত হইতে রাজ-দণ্ড অপহৃত হইয়াছিল, এবং দেহ হইতে রাজ-পরিচ্ছদ অপসারিত হইয়াছিল, দিল্লীর অর্দ্ধচন্দ্র-শোভিত পতাকা মোগলের পরিবর্ত্তে শূরবংশের শাসন-চিহ্ন প্রকাশ করিতেছিল, এবং দিল্লীর রত্নখচিত সিংহাসন মোগল-বংশীয়ের পরিবর্ত্তে শূরবংশীয় শেরশাহের দেহ-কান্তিতে শোভিত হইতেছিল।

হুমায়ুন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, দেশান্তরে দ্বাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত করেন। এই অনতিদীর্ঘ সময়ের মধ্যে শূর-বংশীয় ছয় জন নৃপতি ক্রমে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সর্ব্বশেষ ভূপতির নাম সেকন্দর। ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের পরাক্রমে সেকন্দর শূর পরাজিত ও রাজ্য হইতে তাড়িত হন। এই সময়ে আকবরের বয়স দ্বাদশ বৎসর, এই বয়সেই তাঁহার পিতামহ ফর্গনার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। সেকন্দরের পর হুমায়ুন পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব-সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। রাজ্যপুনঃপ্রাপ্তির ছয় মাস পরে তিনি একদা স্বীয় পুস্তকালয়ের সোপান হইতে পতিত হইয়া দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন। এই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রাচ্য ভূপতিগণ পুস্তকালয়ে থাকিয়া, পুস্তকপাঠে অনেক সময় যাপন করিতেন। তাঁহাদের নিকটে লক্ষ্মীর ন্যায় সরস্বতীরও সমাদর ছিল। তাঁহা-দের সভা, পণ্ডিত-মণ্ডলীতে সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাকিত। প্রাচ্য দেশের সভামণ্ডপ যে সমস্ত কবি, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও গণিতবিৎ প্রভৃতিতে গৌরবান্বিত থাকিত, ইতিহাস হইতে তাঁহাদের নাম ও কীর্ত্তিকলাপ কখনও বিলুপ্ত হইবে না।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর দিল্লীর সিংহাসনে

আরোহণ করেন। এই সময়ে সাম্রাজ্যের অবস্থা বড় মন্দ ছিল। হুমায়ুনের রাজ্যচ্যুতির পর অধিকাংশ প্রদেশই একে একে দিল্লীর শাসনভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। আকবর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে এইরূপ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন। কিন্তু আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁর সাহস ও কার্য্যপরায়ণতায় অনেক স্থান অধিকৃত হইল। বৈরাম কাল্পী, চন্দেরী, কলিঞ্জর, বুন্দেলখণ্ড ও মালব দিল্লীর অধীন করিলেন। ভারতীয় সল্লি * এইরূপে ভারতবর্ষে মোগল-শাসন বদ্ধমূল করিয়া, পরিশেষে এই মোগল শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। যাহা হউক, বৈরামের বিদ্রোহে আকবরের কোন অনিষ্ট হইল না। আকবর অবিলম্বে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইলে, আকবর দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। রাজপুত-রাজ্যই তাঁহার লক্ষ্য হইয়া উঠে। আকবর মাড়বারের একটি নগর নষ্ট করিয়া ১৫৬৭ অব্দে চিতোরের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করেন।

* সল্লি ফ্রান্সের অধিপতি চতুর্থ হেন্‌রির রাজস্ব-সচিব ছিলেন। রাজনীতিতে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। আকবর ও বৈরাম খাঁ এবং চতুর্থ হেন্‌রি ও সল্লি, ইহাঁরা সকলেই প্রায় এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

যে রাজ্যে রাজা আপনার ইচ্ছানুসারে সমস্ত কার্য্য করেন, সেই রাজ্যে মঙ্গল ও অমঙ্গল, রাজার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইলে, সেই রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হয়; রাজা পাপ-পরায়ণ হইলে, সেই রাজ্য অবনতির চরম সীমায় পতিত হইয়া থাকে। রাজা শৌর্য্য ও সাহস-সম্পন্ন হইলে, সেই রাজ্য অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে অটল থাকে। রাজা ভীরুস্বভাব হইলে, সেই রাজ্য শত্রুর আক্রমণে উৎসন্ন হইয়া যায়। দিল্লীর আকবর শাহ ও চিতোরের উদয় সিংহের রাজত্ব ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

উদয় সিংহ যে বয়সে চিতোরের অধিপতি হন, আকবরও সেই বয়সে দিল্লীর শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। উভয়ের মধ্যে বয়ঃক্রমের এইরূপ সমতা থাকিলেও, অন্যান্য অনেক বিষয়ে বৈষম্য ছিল। হুমায়ুন বাবরের নিকটে যেরূপে কষ্ট-সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিয়াছিলেন, আকবরও হুমায়ুনের নিকটে সেইরূপ কষ্ট-সহিষ্ণুতা অভ্যাস করেন! পিতামহের মহামন্ত্রে দিক্ষীত হইয়া, আকবর ক্রমে কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরিশ্রমশীল হইয়া উঠেন। এদিকে বৈরাম খাঁ, আবুয়ল ফজল ও তোডর মল্লের ন্যায় বিচক্ষণ যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞগণ শাসনকার্য্যে আকবরের সাহায্য করেন। উদয় সিংহ এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই, এমন কষ্ট-সহিষ্ণু

হইয়াও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন নাই। মোগল ও রাজপুতের মধ্যে এইরূপ সৌভাগ্য ও শাসনোচিত ক্ষমতার বিভিন্নতা ছিল। এক জন অদৃষ্টের বিপাকে পড়িয়া, নানাস্থানে যাইয়া, মানবচরিত্রে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, অন্য জন প্রাকার-বেষ্টিত পার্ব্বত্য-দুর্গে জন্মিয়া সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিলেন। অবারিত সংসার এক জনের বৈষয়িক জ্ঞান প্রসারিত করিয়াছিল, সঙ্কীর্ণ গিরিকন্দর অপরের বৈষয়িক জ্ঞান সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখিয়াছিল।

আকবর মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্থাপয়িতা। তিনিই প্রথমে রাজপুত-স্বাধীনতার গৌরব হরণ করেন। সাহাবদ্দীন ও আলার ন্যায় তিনিও রণমত্ত রাজপুত-দিগকে তরবারির আঘাতে খণ্ড খণ্ড করেন। যে ধর্ম্মান্ধতা পাঠান-রাজত্বে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা মোগল সাম্রাজ্যের শিরোভূষণ আকবরের রাজত্বেও প্রকাশ পায়। আকবর, আলার ন্যায় রাজপুতের আরাধ্য একলিঙ্গের মন্দিরের উপকরণ দ্বারা আপনাদিগের ধর্ম্মপুস্তক কোরাণের জন্য মম্বা (বেদি) নির্ম্মাণ করিতেও ক্রুটি করেন নাই। এরূপ হইলেও এক সময়ে আকবরের কীর্ত্তিতে মোগল সাম্রাজ্য গৌরবান্বিত হইয়াছিল এবং এক সময়ে আকবর অসীম প্রতাপশালী হইয়া, চতুর্দ্দিকে আপনার গৌরব বিস্তার করিয়াছিলেন।

আকবর সৈন্যদল লইয়া চিতোর আক্রমণ করিলে, উদয় সিংহ জয়মল্ল নামক প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীরের হস্তে নগর-রক্ষার ভার দিয়া, স্বয়ং অবসর গ্রহণ করেন। জয়মল্ল সাহস, বীরত্ব প্রভৃতি গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন; তিনি বিশিষ্ট দক্ষতার সহিত চিতোররক্ষার বন্দোবস্ত করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চিতোর দীর্ঘকাল তাঁহার রক্ষাধীন থাকে না। জয়মল্ল একদা রাত্রিকালে মশালের আলোকে নগরের ভগ্ন প্রাচীরের সংস্কারকার্য্য দেখিতেছিলেন, ইত্যবসরে আকবর শাহ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, তৎপ্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন। গুলির আঘাতে জয়মল্লের তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়। এইরূপ গুপ্তহত্যা আকবরের চরিত্রের একটি কলঙ্ক। সম্মুখযুদ্ধ করাই যুদ্ধবীরের চিরন্তন পদ্ধতি, গোপনে নিরস্ত্র শত্রুর প্রাণ সংহার করা নৃশংসতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ। বলা বাহুল্য, আকবর অন্যান্য সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াও, উপস্থিত স্থলে এইরূপ নৃশংসতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

সেনাপতির বিরহে চিতোর-বাসিগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে। এ দিকে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের প্রধান প্রধান বীরগণের পতন হয়। অবশেষে পুত্ত চিতোরের সৈন্যের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। পুত্ত ষোড়শবর্ষীয় বালক কিন্তু এই বালকের হৃদয় সাহসপূর্ণ

ছিল। বস্তুতঃ সাহসে ও বীরত্বে পুত্ত পৃথিবীর আরাধ্য দেবতা। স্বদেশ-বৎসলতার জন্য পুত্তের নাম অমর-শ্রেণীতে নিবেশিত হইবার যোগ্য। পিতা রণস্থলে দেহ ত্যাগ করিলে, পুত্ত অতুলসাহসে যুদ্ধে যাইতে উদ্যত হন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে সমরসজ্জায় সজ্জিত করিয়া, "রণস্থল হইতে পলায়ন অপেক্ষা জন্মভূমির রক্ষার নিমিত্ত মৃত্যুও শ্রেয়স্কর" বলিয়া, বিদায় দেন। পুত্ত মাতৃ-আজ্ঞা পালনে প্রতিশ্রুত হইয়া, রণ-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। পুত্তের অসাধারণ পরাক্রমে যবন-সৈন্য বিধ্বস্তপ্রায় হইয়া উঠে। এইরূপ লোকা-তীত উৎসাহ-সহকারে যুদ্ধ করিয়া, পুত্ত মাতৃ-আজ্ঞা পালন করেন। আকবর শাহ শক্রর শূরোচিত গুণ বিস্মৃত হন নাই। তিনি এ বিষয়ে বিশিষ্ট উদারতা দেখাইয়া, প্রকৃত বীরের সম্মান রক্ষা করেন। জয়মল্ল ও পুত্তের বীরত্বে আকবরের হৃদয় এতদূর আকৃষ্ট হয় যে, তিনি স্বীয় লেখনীতে তাঁহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি বর্ণনা করিতে ক্রটি করেন নাই। এতদ্ব্যতীত আকবর তাঁহার দিল্লীস্থ প্রাসাদ-দ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটি প্রকাণ্ডকায় হস্তী নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহার উপর জয়মল্ল ও পুত্তের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করেন। বিখ্যাত ফরাসী ভ্রমণকারী বার্ণিয়ারের সময়েও এই প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় ভাল অবস্থায় ছিল। আকবর এইরূপে পরাক্রান্ত শক্রর

মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

পুত্তের প্রাণবায়ুর সহিত চিতোরের সৌভাগ্য অন্তর্হিত হয়। অবিলম্বে শোচনীয় জহরব্রতের অনুষ্ঠান হইতে থাকে। রাজপুতের মহিলাগণ জ্বলন্ত চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। আট হাজার রাজপুত বীর একত্র বীরা * গ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অরাতিনিপাত করিতে করিতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হয়। এইরূপ করাল হুতাশন-শিখা ও করাল নরশোণিতপ্রবাহ দেখিয়া, চিতোর-রাজলক্ষ্মী চিতোর হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

কার্থেজের প্রসিদ্ধ বীর হানিবল 'কানি' নামক সমর-ক্ষেত্রে জয়ী হইলে, আপনার কৃতকার্য্যতার পরিচয়ার্থ রোমীয়দিগের অঙ্গুরীয়কসমূহ আহরণ পূর্ব্বক, ধামা দ্বারা পরিমাণ করিয়াছিলেন। আকবরও এইরূপে রাজপুতদিগের উপবীতসমূহ উন্মোচন পূর্ব্বক পরিমাণ করেন। পরিমাণে উহা ৭৪॥০ মণ † হয়। রাজস্থানের ব্যবসায়িগণের মধ্যে পত্রপৃষ্ঠে ৭৪॥০ অঙ্কপাতের পদ্ধতি আছে। ইহার অর্থ এই, যাঁহারা

* বীরা অর্থাৎ সজ্জিত তাম্বূল। বিদায়সময়ে রাজপুতদিগের মধ্যে বীরাপ্রদানের পদ্ধতি আছে।

† এ স্থলে মণের পরিমাণ চারি সের।

ঐ পত্র উন্মোচন করিবেন, চিতোরধ্বংসের সমস্ত পাপ-ভার তাঁহাদের স্কন্ধে পতিত হইবে। অনেক স্থানে অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই পদ্ধতির প্রচার দৃষ্ট হয়। বহুশত বৎসর অতীত হইল, চিতোর বিধ্বস্ত হইয়াছে, অদ্যাপি ৭৪৷৷০ অঙ্কে পত্র পৃষ্ঠে জাজ্জ্বল্যমান থাকিয়া ঐ শোচনীয় সংবাদ সাধারণের নিকটে প্রচার করিতেছে।

উদয় সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন; পরিশেষে তথা হইতে আরাবলী পর্ব্বতের উপত্যকায় উপস্থিত হন। চিতোর-ধ্বংসের পূর্ব্বে উদয় সিংহ উপত্যকার প্রবেশপথে একটি হ্রদ খনন করাইয়া, উহার নাম "উদয় সাগর" রাখিয়াছিলেন। এখন তিনি ঐ স্থানে একটি নগর স্থাপন করিয়া, নিজের নামানুসারে উহার নাম উদয়পুর রাখেন।

উদয় সিংহ চিতোরধ্বংসের পর চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রসন্তানগণের মধ্যে প্রতাপ সিংহ পৈতৃক উপাধি ও গদির উত্তরাধিকারী হন।

এইরূপে প্রতাপ বংশানুগত "রাণা" উপাধি ধারণ করিলেন। এইরূপে মিবারের গৌরব-সূর্য্য উজ্জ্বল হইবার সূত্রপাত হইল। যদিও চিতোর বিধ্বস্ত হইয়াছিল, যদিও যবনের পরাক্রমে রাজপুতগণ হতাশ্বাস

হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি প্রতাপের হৃদয় বিচলিত হয় নাই। তিনি চিতোর উদ্ধার করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতক্ষণ বাপ্পা রাওর শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ তিনি এই সঙ্কল্প হইতে বিরত হইবেন না; প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতক্ষণ গোহিলোট বংশের গৌরব মিবারের ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে, ততক্ষণ তিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিবেন না। প্রতাপ এইরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া, উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। উচ্চতর সঙ্কল্প, মহত্তর সাধনা তাঁহার হৃদয়কে উচ্চতর করিয়া তুলিল। তিনি স্বদেশ-হিতৈষিতা, স্বজাতি-প্রিয়তায় উদ্দীপ্ত হইয়া, অনুচরবর্গকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্রতাপের এইরূপ উৎসাহ, এইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা দেখিয়া, অনেকে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল বটে, কিন্তু প্রধান প্রধান রাজপুতগণ মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মাড়বার, আম্বের, বিকানের এবং বুঁদীর অধিপতিগণও স্বজাতি- প্রিয়তায় জলাঞ্জলি দিয়া, আকবরের পক্ষসমর্থনে ত্রুটি করিলেন না। অধিক কি, তাঁহার ভ্রাতাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, শত্রু-দলে মিশিলেন। কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ প্রতাপ ইহাতেও হতাশ্বাস হইলেন না; তিনি বাপ্পা রাওর শোণিত কলঙ্কিত না করিয়া, স্বদেশের উদ্ধারার্থ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিলেন।

প্রতাপ এইরূপে স্বজাতি—স্ববন্ধু কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, ২৫ বৎসর কাল মোগল-শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করেন। এই সময়ে এক এক বার তাঁহার দুরবস্থার এক শেষ হয়। স্বয়ং পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া, স্ত্রী-পুত্রের সহিত পার্ব্বত্য ফল খাইয়া, কষ্টে কালাতিপাত করেন, তথাপি তিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। এরূপ স্বাধীনত্ব-প্রিয়তা পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ।

চিতোর-ধ্বংসের স্মরণার্থ প্রতাপ সর্ব্বপ্রকার বিলাস-দ্রব্যের উপভোগ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র পরিত্যাগ করিয়া, বৃক্ষ-পত্রে অন্ন আহার করিতেন, কোমল শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, তৃণাচ্ছাদিত শয্যায় শয়ন করিতেন এবং ক্ষৌরকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, লম্বমান দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতেন। তাঁহার আজ্ঞায় অগ্রবর্ত্তী রণ-দুন্দুভি, সকলের পশ্চাতে ধ্বনিত হইত। মিবারের এই শোকচিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, অদ্যাপি প্রতাপের বংশীয়গণ স্বর্ণ ও রৌপ্যময় আহার-পাত্রের নীচে বৃক্ষ-পত্র ও শয্যার নীচে তৃণ রাখিয়া থাকেন।

প্রতাপ পৈতৃক গদিতে আরোহণ করিয়া, কতিপয় অভিজ্ঞ সর্দ্দারের সাহায্যে শাসন-কার্য্য ও রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন করিতে লাগিলেন; যে

কয়েকটি পার্ব্বত্য দুর্গ হস্তে ছিল তৎসমুদয় সুদৃঢ় করিলেন। যতদিন মোগলদিগের সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তত দিন তাঁহার আজ্ঞায় বনাস্ ও বেরিস নদীর উভয় তীরবর্ত্তী উর্ব্বর-ভূমিতে কেহই থাকিতে পারিত না। নিজের আদেশ যথাবিধি পালিত হয় কি না, তাহার প্রতি প্রতাপের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রায়ই কতিপয় অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে স্থানীয় লোকের কার্য্য-কলাপ পরিদর্শন করিতেন। তাঁহার কঠিন আদেশে উর্ব্বরক্ষেত্র মরুভূমির ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়াছিল, তৃণরাজি শস্য-সমূহের স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল, গন্তব্য পথ কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষে অগম্য হইয়াছিল এবং মনুষ্যের আবাসভূমি বিবিধ বন্য জন্তুর বিহারক্ষেত্র হইয়াছিল। প্রতাপ এইরূপে সমুদয় ভূমি জঙ্গলময় করিয়া, বিজেতা মোগলদিগের লাভের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন।

যে সমস্ত রাজপুত মোগলদিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, প্রতাপ তাঁহাদিগকে সাতিশয় ঘৃণা করিতেন। আম্বেরের রাজা মানসিংহের সহিত আকবরের এইরূপ সম্বন্ধ থাকাতে, প্রতাপ মানসিংহের সহিত সমুদয় সামাজিক সম্বন্ধ উঠাইয়া দেন। একদা মানসিংহ সোলাপুর অধিকার করিয়া, ফিরিয়া আসিতেছিলেন এমন সময় প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিবার

অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। প্রতাপ সিংহ এই সময়ে কমলমীর প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন; তিনি আম্বের-রাজের অভিনন্দন জন্য উদয়সাগরের তীরে উপস্থিত হইলেন। অবিলম্বে এই স্থানে সমৃদ্ধ ভোজের আয়োজন হইল; প্রতাপের পুত্র কুমার অমর সিংহ, রাজা মানের অভ্যর্থনার জন্য, এই স্থলে উপস্থিত ছিলেন; মানসিংহ নির্দ্দিষ্ট স্থলে সমাগত হইলে, অমর সিংহ পিতার অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করিয়া, তাঁহাকে ভোজন-স্থলে বসাইলেন। মানসিংহ প্রতাপের সহিত একত্র ভোজন করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করাতে, প্রতাপ দুঃখসহকারে কহিয়া পাঠাইলেন, যিনি তুরুককে নিজের ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ যিনি তুরুকের সহিত আহারও করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিতে পারেন না। রাজা মান, প্রতাপ সিংহের এই বাক্যে অপমান জ্ঞান করিয়া, ভোজন-স্থল হইতে গাত্রোত্থান করেন। প্রতাপ সিংহ এই সময়ে ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, রাজা মান অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "যদি আমি তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব না করি, তাহা হইলে আমার নাম মানসিংহ নহে।" মানসিংহ এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে, পবিত্র গঙ্গাজল দ্বারা ভোজনস্থান ধৌত করা হয়, এবং

যাঁহারা এই ভোজের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন, তাঁহারা স্নান করিয়া, বস্ত্রান্তর গ্রহণ করেন। এই বিষয় আকবরের শ্রুতি-প্রবিষ্ট হইলে, আকবর মানসিংহের প্রতি প্রতাপ সিংহের তাদৃশ ব্যবহারে, আপনাকে যারপরনাই অপমানিত জ্ঞান করিলেন। অবিলম্বে এই অপমানের প্রতিশোধ জন্য সংগ্রামের অনুষ্ঠান হইল। মানসিংহ ও মহব্বত খাঁ সৈন্যদল লইয়া প্রতাপের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

প্রতাপ বাইশ হাজার রাজপুতের সাহস ও স্বদেশীয় পর্ব্বতমালার উপর নির্ভর করিয়া, ঐ সৈন্যদলের গতিরোধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। যে স্থলে তাঁহার সৈন্য সন্নিবেশিত হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার প্রায় আট মাইল। এই স্থান কেবল পর্ব্বত, অরণ্য ও ক্ষুদ্র নদীতে সমাবৃত। ইহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ সকল দিকেই উন্নত পর্ব্বত লম্বভাবে রহিয়াছে। এই গিরি-সঙ্কট হল্‌দিঘাট নামে প্রসিদ্ধ। প্রতাপ মিবারের আশা-ভরসার স্থল রাজপুতদিগের সহিত এই গিরি-সঙ্কট আশ্রয় করিয়া, দণ্ডায়মান হন। মোগল সৈন্য উপস্থিত হইলে, তুমুল সংগ্রাম হয়। রাজপুতগণ অসামান্য পরাক্রম—অশ্রুতপূর্ব্ব সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন; বিজয়-শ্রী মোগলের পক্ষ অবলম্বন করেন; চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুতের শোণিতে হল্‌দি-

ঘাটের ক্ষেত্র রঞ্জিত হয়; প্রতাপ জয়লাভে নিরাশ হইয়া, রণস্থল পরিত্যাগ করেন।

এইরূপে হলদিঘাট সমরের অবসান হয়, এইরূপে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত হলদিঘাট রক্ষার্থ অম্লানবদনে, অসঙ্কুচিত চিত্তে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করে। হলদিঘাট পরম পবিত্র যুদ্ধ-ক্ষেত্র। কবির রসময়ী কবিতায় ইহা অনন্তকাল নিবদ্ধ থাকিবে, ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় ইহা অনন্তকাল ঘোষিত হইবে। প্রতাপ সিংহ অনন্তকাল বীরেন্দ্রসমাজে হৃদয়গত শ্রদ্ধার পূজা পাইবেন এবং পবিত্রতর হইয়া, অনন্তকাল অমরশ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট থাকিবেন।

প্রতাপ অনুচর-বিহীন হইয়া চৈতক নামক নীলবর্ণ অশ্ব আরোহণে রণস্থল পরিত্যাগ করেন। এই অশ্বও তেজস্বিতায় প্রতাপের ন্যায় রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। যখন দুই জন মোগল সর্দ্দার প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবমান হয়, তখন চৈতক লম্ফদিয়া একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সরিৎ পার হইয়া স্বীয় প্রভুকে রক্ষা করে। কিন্তু প্রতাপের ন্যায় চৈতকও যুদ্ধস্থলে আহত হইয়াছিল। এই আঘাতে পথিমধ্যে চৈতকের প্রাণ বিয়োগ হয়। প্রিয়তম বাহনের স্মরণার্থ প্রতাপ এই স্থলে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাপি এই স্থান "চৈতককা চবুতর্" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে চিরস্মরণীয় হল্‌দি-ঘাট মিবারের গৌরব-স্বরূপ রাজপুতগণের শোণিত-স্রোতে প্রক্ষালিত হয়। এ দিকে মোগল সৈন্য বিজয়ী হইয়া, রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। কমলমীর ও উদয়পুর শক্রর হস্তে পতিত হইল। প্রতাপ পরিবার-বর্গের সহিত এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে, এক অরণ্য হইতে অন্য অরণ্যে, এক গহ্বর হইতে অন্য গহ্বরে যাইয়া, অনুসরণকারী মোগলদিগের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, তথাপি প্রতাপের কষ্টের অবধি রহিল না; প্রতি নূতন বৎসর, নূতন নূতন কষ্ট সঞ্চয় করিয়া, প্রতাপের নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সময় প্রতাপ সিংহ এরূপ দুরব-স্থায় পড়িয়াছিলেন যে, একদা বিশ্বাসী ভিলগণ প্রতা-পের পরিবারবর্গকে কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া, আহারদ্বারা সকলের প্রাণরক্ষা করে।

প্রতাপের এইরূপ অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও অশ্রুত-পূর্ব্ব কষ্টে সদাশয় শক্রর হৃদয়ও আর্দ্র হইল। দিল্লীর প্রধান অমাত্য এইরূপ স্বদেশ-হিতৈষিতায় মোহিত হইয়া, প্রতাপকে সম্বোধন পূর্ব্বক, এই ভাবে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন, "পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নহে। ভূমি ও সম্পত্তি অদৃশ্য হইবে; কিন্তু মহৎ লোকের

ধর্ম্ম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। প্রতাপ সম্পত্তি ও ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও মস্তক অবনত করেন নাই। হিন্দুস্থানের রাজগণের মধ্যে তিনিই কেবল স্বীয় বংশের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।" প্রতাপ এইরূপে বিধর্ম্মী শত্রুরও প্রশংসা-ভাজন হইয়া, বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাণাধিক বনিতা ও সন্তানগণের কষ্ট এক এক সময়ে তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। দুরন্ত মোগলগণ এপর্য্যন্তও তাঁহার অনুসরণে ক্ষান্ত হইল না। তিনি পাঁচ বার খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করেন, কিন্তু সুবিধার অভাবে পাঁচ বারই তাহা পরিত্যাগ করিয়া, পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করেন। একদা তাঁহার মহিষী ও পুত্রবধূ ঘাসের বীজ দ্বারা কয়েকখানি রুটী প্রস্তুত করেন। এই খাদ্যের একাংশ সকলে সেই সময় ভোজন করিয়া, অপরাংশ ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেন। কিন্তু একটি বন্য মার্জ্জার অকস্মাৎ এই অবশিষ্ট রুটী লইয়া, পলায়ন করে। অবশিষ্ট খাদ্য অপহৃত হইল দেখিয়া, প্রতাপের একটি দুহিতা কাতরভাবে কাঁদিয়া উঠে; প্রতাপ অদূরে তৃণশয্যায় শয়ান থাকিয়া, আপনার শোচনীয় অবস্থার বিষয় ভাবিতেছিলেন, দুহিতার আর্ত্তস্বরে চমকিত হইয়া দেখেন, খাদ্য সামগ্রী অপহৃত হওয়াতে বালিকা রোদন করিতেছে। প্রতাপ অম্লানবদনে

হল্‌দিঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিত-স্রোত দেখিয়াছিলেন, অম্লানবদনে স্বদেশীয়দিগকে স্বদেশের সম্মানরক্ষার্থ আত্ম-প্রাণ উৎসর্গ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, অম্লানবদনে রাজপুত জাতি—রাজপুত-বংশের গৌরবরক্ষার জন্য রণস্থলের সংহারমূর্ত্তির বিভীষিকায় দৃক্‌পাত না করিয়া, কহিয়াছিলেন, "এই ভাবে দেহ-বিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।" কিন্তু এখন তিনি স্থিরচিত্তে তনয়ার কাতরতা দেখিতে সমর্থ হইলেন না। স্নেহাস্পদ বালিকাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল, যেন শত শত কাল ভুজঙ্গ আসিয়া, সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিল, প্রতাপ আর যাতনা সহিতে পারিলেন না, আপনার কষ্ট দূর করিবার জন্য আকবরের নিকট আত্ম-সমর্পণের অভিপ্রায় জানাইলেন।

প্রতাপের এই অধীনতা-স্বীকারের সংবাদে আকবর নগরমধ্যে মহোল্লাসে উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন। প্রতাপ আকবরের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই পত্র পৃথ্বীরাজ দেখিতে পাইলেন। পৃথ্বীরাজ বিকানেরের অধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। স্বজাতি-প্রিয়তা ও স্বদেশহিতৈষিতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তিনি প্রতাপকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। প্রতাপ হঠাৎ দিল্লীশ্বরের নিকটে অবনতমস্তক

হইবেন, ইহা ভাবিয়া তিনি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। পৃথ্বীরাজ আর কালবিলম্ব না করিয়া, নিম্নলিখিতভাবে কয়েকটি কবিতা রচনা পূর্ব্বক, প্রতাপের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন;—

"হিন্দুদিগের সমস্ত আশাভরসা হিন্দুজাতির উপরেই নির্ভর করিতেছে। রাণা এখন সে সকল পরিত্যাগ করিতেছেন। আমাদের সর্দ্দারগণের সে বীরত্ব নাই, নারীগণের সে সতীত্ব-গৌরব নাই। প্রতাপ না থাকিলে, আকবর সকলকেই এই সমভূমিতে আনয়ন করিতেন। আমাদের জাতির বাজারে আকবর একজন দালাল; তিনি সকলকেই কিনিয়াছেন, কেবল উদয়ের তনয়কে কিনিতে পারেন নাই। সকলেই হতাশ্বাস হইয়া, নৌরোজার বাজারে আপনাদের অপমান দেখিয়াছেন, কেবল হামীরের বংশধরকে আজ পর্য্যন্ত সে অপমান দেখিতে হয় নাই। জগৎ জিজ্ঞাসা করিতেছে, প্রতাপের অবলম্বন কোথায়? পুরুষত্ব ও তরবারিই তাঁহার অবলম্বন। তিনি এই অবলম্বন-বলেই ক্ষত্রিয়ের গর্ব্ব রক্ষা করিতেছেন। বাজারের এই দালাল কিছু চিরদিন জীবিত থাকিবে না। এক দিন অবশ্যই ইহলোক হইতে অপসৃত হইবে। তখন আমাদের জাতির সকলেই পরিত্যক্ত ভূমিতে রাজপুত-বীজের বপন জন্য প্রতাপের নিকট

উপস্থিত হইবে। যাহাতে ঐ বীজ রক্ষিত হয়, যাহাতে উহার পবিত্রতা পুনর্ব্বার উজ্জ্বল হইতে পারে, তাহার জন্য সকলেই প্রতাপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।"

পৃথ্বীরাজের এই উৎসাহ-বাক্য শত সহস্র রাজপুতের তুল্য বলকারক হইল। ইহা প্রতাপের দেহে জীবনীশক্তি দিল এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বদেশের গৌরবকর মহৎকার্য্য সাধনে উত্তেজিত করিল। প্রতাপ দিল্লীশ্বরের নিকট অবনতি স্বীকারের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এই সময়ে বর্ব্বার এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, প্রতাপ কিছুতেই পর্ব্বত-কন্দরে থাকিতে না পারিয়া, মিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মরুভূমি অতিবাহন করিয়া, সিন্ধুনদের তটে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সঙ্কল্পসিদ্ধির মানসে তিনি পরিবারবর্গ ও মিবারের কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুতের সহিত আরাবলী হইতে নামিয়া, মরুপ্রান্তে উপনীত হন। এই সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ আনিয়া, প্রতাপের নিকট উপস্থিত করিলেন। এই সম্পত্তি এত ছিল যে, ইহাদ্বারা দ্বাদশ বর্ষকাল পঞ্চবিংশতি সহস্র ব্যক্তির ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হইতে পারিত। কৃতজ্ঞতার এই মহৎ দৃষ্টান্তে প্রতাপ পুনর্ব্বার সাহসসহকারে অভীষ্ট মন্ত্র সাধনে উদ্যত হইলেন।

অবিলম্বে অনুচরবর্গ একত্র হইল। প্রতাপ ইহাদিগকে লইয়া, দেবীরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে মোগল সৈন্য পরাজয় করিলেন। কমলমীর ও উদয়পুর হস্তগত হইল। ক্রমে চিতোর, আজমীঢ় ও মণ্ডলগড় ব্যতীত সমস্ত মিবার প্রদেশ প্রতাপের পদানত হইয়া উঠিল। পরাক্রান্ত আকবর শাহ বহু বৎসর কাল বহু অর্থ ব্যয় ও বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া, মিবারে যে বিজয়শ্রী লাভ করিয়াছিলেন, প্রতাপ সিংহ এক দেবীরের যুদ্ধে তাহা আপনার হস্তগত করিলেন। কিন্তু এইরূপ বিজয়ী হইলেও, প্রতাপ জীবনের শেষ অবস্থায় শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পর্ব্বত-শিখরে উঠিলেই, তাঁহার নেত্র চিতোরের দুর্গ-প্রাচীরের দিকে নিপতিত হইত, অমনি তিনি যাতনায় অধীর হইয়া পড়িতেন। যে চিতোরে বাপ্পা রাওর জীবিতকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, যে চিতোরে রাজপুত-কুল-গৌরব সমরসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ দৃশদ্বতী নদীর তীরে পৃথ্বীরাজের সহিত দেহত্যাগ করিতে সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিলেন, যে চিতোরে বাদল জয়মল্ল ও পুত্ত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অম্লানবদনে—অক্ষুব্ধহৃদয়ে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, অদ্য সেই চিতোর, শ্মশান! অদ্য সেই চিতোরের প্রাচীর অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ভীষণ শৈল-শ্রেণীর ন্যায় রহিয়াছে। প্রতাপ প্রায়ই এইরূপ চিন্তায়—এইরূপ

কল্পনায় অবসন্ন হইতেন, প্রায়ই তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইত।

এইরূপ অন্তর্দ্দাহে প্রতাপ তরুণ বয়সেই ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। দুরন্ত রোগ আসিয়া শীঘ্র তাঁহার দেহ অধিকার করিল। প্রতাপ ও তাঁহার সর্দ্দারগণ পেশোলা হ্রদের তীরে, দুর্গতির সময় আপনাদিগকে বর্ষা হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কুটীরেই প্রতাপের জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত হয়। প্রতাপ স্বীয় তনয় অমর সিংহের প্রতি আস্থা-শূন্য ছিলেন। তিনি জানিতেন, কুমার অমর সিংহ সৌখীন যুবক; রাজ্য-রক্ষার ক্লেশ কখনই তাঁহার সহনীয় হইবে না। তনয়ের বিলাস-প্রিয়তায় প্রতাপ হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন; অন্তিম সময়েও এই যাতনা তাঁহা হইতে অন্তর্হিত হইল না; এই দুঃসহ মনোবেদনায় আসন্নমৃত্যু-প্রতাপের মুখ হইতে বিকৃত স্বর বাহির হইতে লাগিল। এক জন সর্দ্দার ইহা দেখিয়া, প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার এমন কি কষ্ট হইয়াছে যে, প্রাণবায়ু শান্তভাবে বহির্গত হইতে পারিতেছে না। প্রতাপ উত্তর করিলেন, "যাহাতে স্বদেশ তুরুকের হস্তগত না হয়, তদ্বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি জানিবার জন্য আমার প্রাণ এখনও অতি কষ্টে বিলম্ব করিতেছে।"

পরিশেষে তিনি কুটীর লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হয় ত এই কুটীরের পরিবর্ত্তে বহুমূল্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে, আমরা মিবারের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, হয় ত তাহা এই কুটীরের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে।" সর্দ্দারগণ প্রতাপের এই বাক্যে শপথ করিয়া কহিলেন, "যে পর্য্যন্ত মিবার স্বাধীন না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোনও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে না।" প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল। মিবার আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে শুনিয়া, তিনি শান্তভাবে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন।

এইরূপে স্বদেশ-বৎসল প্রতাপ সিংহের পরলোক-প্রাপ্তি হইল। যদি মিবারে থিউকিদিদিস অথবা জেনোফন থাকিতেন, তাহা হইলে 'পেলপনিসসের সমর' অথবা 'দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন' * কখনওএই

গ্রীসের দুইটি নগর স্পার্টা ও এথিনা। এথিনা পারস্যের সহিত যুদ্ধে বিশেষ গৌরবান্বিত হইলে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্পার্টা অসূয়াপরবশ হইয়া সমর-সজ্জার আয়োজন করে। ইহাই "পেলপনিসসের যুদ্ধ" বলিয়া বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক থিউকিদিদিস্ এই মহাসমরের সবিস্তর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পারস্যের রাজা দ্বিতীয় দরায়স্ লোকান্তরগত হইলে, তাঁহার পুত্র অর্ত্তক্ষত্র পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অর্ত্তক্ষত্রের ভ্রাতা কাইরস রাজ্য-প্রাপ্তির জন্য দশ সহস্র গ্রীক সৈন্যের সাহায্যে সমরে প্রবৃত্ত হন। খ্রীঃ পূঃ ৪০১ অব্দে কাইরস সমরে নিহত হইলে, গ্রীক সেনাপতি জেনোফন তাঁহার দশ সহস্র সৈন্যের সহিত বিশিষ্ট পরাক্রম ও কৌশলসহকারে স্বদেশে প্রত্যাগত

রাজপুত-শ্রেষ্ঠের অবদান অপেক্ষা ইতিহাসে অধিক-তর মধুরভাবে কীর্ত্তিত হইত না। অনমনীয় বীরত্ব, বিচলিত দৃঢ়তা, অশ্রুতপূর্ব্ব অধ্যবসায়সহকারে প্রতাপ দীর্ঘকাল প্রবল-পরাক্রান্ত, উন্নতাকাঙ্ক্ষ, সহায় সম্পন্ন সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। এ জন্য আজ পর্য্যন্ত প্রতাপ সিংহ প্রত্যেক রাজপুতের হৃদয়ে দেবতা-রূপে বিরাজ করিতেছেন। যত দিন রাজপুতের স্বদেশহিতৈষিতা থাকিবে, ততদিন প্রতাপ সিংহের এই দেব-ভাবের ব্যত্যয় হইবে না।

প্রতাপ সিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, দুরন্ত যবন হইতে মাতৃভুমির উদ্ধারার্থ যে সমস্ত মহৎ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, রাজস্থানের ইতিহাসে তাহা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। শতাব্দের পর শতাব্দ অতীত হইয়াছে, অদ্যাপি রাজস্থানের লোকের স্মৃতিতে এই বৃত্তান্ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্ব-পুরুষের এই বৃত্তান্ত বলিবার সময় রাজপুতের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব তেজের আবির্ভাব হয়, ধমনী মধ্যে রক্তের গতি প্রবল হয়, এবং নয়ন-জলে গণ্ডদেশ প্লাবিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রতাপ সিংহের কার্য্য-পরম্পরা রাজ-স্থানের অদ্বিতীয় গৌরব ও অদ্বিতীয় মহত্ত্বের বিষয়।

হন। ইহাই "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন" বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। গ্রীক সেনা-পতি ও ইতিহাস-লেখক জেনোফন ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিয়াছেন।

কোনও ব্যক্তি রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ও সর্ব্ব-প্রকার সৌভাগ্য-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, প্রতাপের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হন নাই, কোনও ব্যক্তি স্বদেশহিতৈষিতায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্বাধীনতারক্ষার্থ বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া, প্রতাপের ন্যায় কষ্ট ভোগ করেন নাই। আরাবলী পর্ব্বত-মালার সমস্ত দরী, সমস্ত উপত্যকাই প্রতাপ সিংহের জন্য গৌরবান্বিত রহিয়াছে। চিরকাল ঐ গৌরব-স্তম্ভ উন্নত থাকিয়া, রাজস্থানের মহিমা প্রকাশ করিবে। ভারত-মহাসাগরের সমগ্র বারিতেও উহা নিমগ্ন হইবে না; হিমালয়ের সমগ্র শৃঙ্গপাতেও উহা বিচূর্ণ হইবে না।

পলিনেসিয়ার বিবরণ।

প্রশান্ত মহাসাগরে যে সকল দ্বীপপুঞ্জ লক্ষিত হয়, তাহার সাধারণ নাম পলিনেসিয়া। অল্প দিন হইল, এই সকল দ্বীপের বিবরণ সাধারণের পরিজ্ঞাত হইয়াছে। পলিনেসিয়া দ্বীপসমূহের উৎপত্তির বিবরণ অতি অদ্ভুত। জগদীশ্বরের অসীম শক্তিতে কত স্থানে যে, কত বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অতি সামান্য পদার্থও ঈশ্বরের মহিমায় দুরূহ কার্য্য সাধন করিয়া, সাধারণকে চমৎ-

কৃত করিয়া তুলিতেছে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, সমুদ্র-গর্ভস্থ প্রবাল কীটসকল পলিনেসিয়ার অধিকাংশ দ্বীপ নির্ম্মাণ করিয়াছে। কি রূপে এমন মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইল, তাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য। এই সমস্ত প্রবাল কীট প্রশান্ত মহা-সাগরকে একবারে রূপান্তরিত করিয়া তুলিয়াছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেখানে অনন্তবিস্তৃত সুনীল বারি-রাশি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হইত না, সেখানে, এখন শত শত দ্বীপ, ফল-পুষ্প-শোভিত ও তরুরাজি-সমাকীর্ণ হইয়া, অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে।

করুণাময় পরমেশ্বর আপনার অনন্ত করুণা-বলে সাগরের উপদ্রব হইতে এই সকল দ্বীপ রক্ষা করিবার উপায় বিধান করিয়াছেন। পলিনেসিয়ার অপেক্ষা-কৃত বৃহৎ দ্বীপগুলির অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে প্রবাল-কীট-নির্ম্মিত এক একটি চক্রাকার প্রাচীর আছে। ঐ সকল প্রাচীর বর্ত্তমান থাকাতে, দ্বীপসমূহে ঊর্ম্মিরাশির আঘাত লাগিতে পারে না। পর্ব্বতাকার সমুদ্র-তরঙ্গ প্রাচীরে আহত হইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হয়। উল্লিখিত প্রাচীরসমূহের স্থানবিশেষে এক একটি দ্বার আছে; ঐ দ্বার দিয়া অর্ণব-পোত সকল দ্বীপে উপনীত হইয়া থাকে।

পলিনেসিয়ার দ্বীপসমূহ মনোহর প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। সমুদ্র হইতে এই সকল দ্বীপ অতি রমণীয় দেখায়। কোন স্থানে হরিদ্বর্ণ তরু-শাখা ও লতা সকল সুন্দর ফলপুষ্পে অলঙ্কৃত হইয়া, সাগর-তটে বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে, কোন স্থানে পুরেট-নামক প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিম্নভাগে অধিবাসীদের পরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর সকল শোভা পাইতেছে, অদূরবর্ত্তী উপত্যকাভাগে শ্যামল শস্যরাশি মন্দ মন্দ পবনভরে সঞ্চালিত হইতেছে, স্থানান্তরে বেগবতী তরঙ্গিণী ঘোর রবে পর্ব্বত-কন্দর হইতে নির্গত হইয়া, উর্ব্বর-ক্ষেত্র সমুদয় পরিবেষ্টন পূর্ব্বক, মহাসাগরে সম্মিলিত হইতেছে; স্থলবিশেষে মেঘমালাসদৃশ পর্ব্বতশ্রেণী জলধি-গর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া, ভীষণভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সাগরতল হইতে এই সকল দর্শন করিলে আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। ফলে পলিনেসিয়ার দ্বীপসকল প্রকৃতির ক্রীড়াকানন বলিয়া বোধ হয়। দ্বীপস্থিত সমস্ত পদার্থই উৎসববেশ ধারণ করিয়া, সর্ব্বত্র শান্তি বিস্তার করে। এই স্থানে পদার্পণ করিলে হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে।

এই সকল দ্বীপের ভূমি যেমন উর্ব্বর, জল বায়ুও তেমন স্বাস্থ্যকর। এখানে অনেক প্রকার ফল ও মূল পাওয়া যায়। ব্রেড্ ফ্রুটের (রুটী ফলের) বৃক্ষ দীর্ঘাকার ও বহুস্থানব্যাপী। উহার পত্রগুলি দস্তুর ও ষোল সতর ইঞ্চি

লম্বা। বৎসরে ঐ বৃক্ষের তিন চারিবার ফল হয়। ফল সকল পক্ক হইলে পীতবর্ণ হইয়া থাকে। এই ফল এখানকার অধিবাসীদিগের প্রধান ভক্ষ্য দ্রব্য। ব্রেড-ফ্রুটের বৃক্ষের তক্তায় গৃহ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরী নির্ম্মিত হয় এবং বল্কলে দ্বীপবাসীদের বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এখানে সুস্বাদু আলু, এরারূট, নারিকেল, কদলী ও ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানের ইক্ষুরসের ন্যায় সুস্বাদু ইক্ষুরস কোথাও পাওয়া যায় না। ইক্ষু হইতে কিরূপে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহা পূর্ব্বে পলিনেসিয়াবাসিগণ অবগত ছিল না। পরিশেষে মিশনরিগণ এখানে আসিয়া, ইহাদিগকে ঐ বিষয় শিখাইয়াছেন। পূর্ব্বে আঙ্গুর, কমলালেবু, তেঁতুল প্রভৃতি এই সকল দ্বীপে জন্মিত না; মিশনরিদের যত্নে এখন তৎসমুদয় প্রচুর পরিমাণে জন্মিতেছে।

পলিনেসিয়ায় সকল প্রকার ভোগ্য দ্রব্য রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। যখন যে বস্তুতে অভিলাষ জন্মে, প্রকৃতির অনুকূলতা বশতঃ তাহাই পাওয়া গিয়া থাকে, পূর্ব্বে কেবল পশুপ্রকৃতিক অসভ্য মনুষ্যগণ এই নন্দন-কানন উপভোগ করিত। তাহারা বৃক্ষের অনায়াস-লব্ধ মধুময় ফল ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইত, সুশীতল ও সুপরিষ্কৃত বারি পান করিয়া তৃষ্ণা শান্তি করিত, মনোহর উদ্যানে পরিভ্রমণ করিত এবং নানাজাতি

বিহঙ্গের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আমোদিত হইত। কে তাহাদের সম্মুখে এই সকল উপভোগ-সামগ্রী প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন, কাহার করুণাবলে তাহারা এইরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখের অধিকারী হইয়াছে, তাহা একবারও ভাবিত না। আহার, নিদ্রা প্রভৃতিই তাহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাহারা কটিদেশে একখণ্ড বল্কল পরিধান ও হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া, মৃগয়া-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। এখন মিশনরিদের যত্নে তাহাদের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হইয়াছে। তাহারা এখন আবাস-দ্বীপের সমস্ত পদার্থই নূতন চক্ষে দেখিতেছে এবং জ্ঞান ও সভ্যতায় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত হইয়া, পবিত্র মানব নামের গৌরবরক্ষায় অগ্রসর হইতেছে।

পলিনেসিয়ার অধিবাসিগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন অতি সুন্দর। ইহারা অতি দীর্ঘ বা অতি মাংসল নহে। কিন্তু অতিশয় কর্ম্মক্ষম। ইহারা কহে, ইউরোপীয়দিগের আগমনের পূর্ব্বে তথায় কদাকার বা রুগ্ন ব্যক্তি ছিল না। ইহাদের ললাট প্রশস্ত, নেত্র দীর্ঘ, উজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ, নাসিকা তিলফুলসদৃশ, ওষ্ঠ মাংসল, দন্ত শুভ্র এবং কর্ণ দীর্ঘ। কেশ অতি কোমল ও কুঞ্চিত, দেহ পিঙ্গলবর্ণ। ইহাদের অবলাগণ অতিশয় বলিষ্ঠ। তাহারা পুরুষের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বটে, কিন্তু আমাদের দেশের নারী-

দিগের অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। ইহাদের মতে কৃষ্ণবর্ণ বলের লক্ষণ। কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দেখিলে, ইহারা বলিয়া উঠে, "আহা! উহার অস্থিসকল কেমন দৃঢ়, ঐ সকল অস্থিতে কেমন সুন্দর বড়িশী ও হাতড়ী হইতে পারে।

দ্বীপবাসিগণ ধীর-প্রকৃতি, প্রসন্ন-হৃদয় ও আতিথেয়। ইহারা অধিক পরিশ্রম করে না এবং অধিক ভোজনও করে না। ইহারা শীঘ্র শীঘ্র নিদ্রাভিভূত হয় এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে। ইহাদের মনোবৃত্তি যত দূর পরিমার্জ্জিত হওয়া উচিত, আজ পর্য্যন্ত ততদূর হইয়া উঠে নাই। অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের লোক অপেক্ষা সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদিগকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের যেমন রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার, ইহারা আপনাদের সমাজে যেমন বাগ্মিতা প্রকাশ করে, এবং ইহাদের যেমন ভাষাগত সৌন্দর্য্য, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, ইহাদের মানসিক বৃত্তি তেজস্বিনী ও উন্নত গুণবিশিষ্টা। দ্বীপবাসিগণ অঙ্কশাস্ত্রে বিলক্ষণ তৎপর। ইহাদের অনেকে বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া, এক বৎসরেই বাইবেলের অর্থ করিতে শিখিয়াছে।

দ্বীপবাসীদিগের সংখ্যা অধিক নহে। সমুদয় দ্বীপে পঞ্চাশ হাজারের অধিক অধিবাসী হইবে না। পূর্ব্বে

লোকসংখ্যা অধিক ছিল। কিন্তু যুদ্ধ, নরহত্যা নরবলি প্রভৃতিতে অনেক লোক নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে দ্বীপবাসিগণ, প্রায়ই পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিত। লাঠি, বড়শা, ধনু, তীর, ইহাদের যুদ্ধাস্ত্র। প্রতি-যুদ্ধেই রুধিরস্রোত প্রবাহিত হইত। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে ইহারা 'ওরা' দেবের নিকট নরবলি দিয়া একাগ্রচিত্তে জয়প্রার্থনা করিত। তাহার পর যুদ্ধ-তরী সকল সংগৃহীত ও সজ্জিত হইত, যুদ্ধাস্ত্র সকল সম্মার্জ্জিত হইত, এবং দলস্থ লোকদিগকে একত্র করিবার জন্য চারিদিকে দূত প্রেরিত হইত। পুরোহিতেরা অনুগ্রহ-লাভের আশায় বিবিধ উপচারে দেবতাদের পূজা করিত। বহুসংখ্য সৈন্য একত্র হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইত। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে এত লোক নিহত হইত যে, শব রাশীকৃত করিলে, তাহা উন্নত নারিকেল বৃক্ষের অগ্রভাগ স্পর্শ করিত। স্ত্রীলোকেরা রণস্থলে তাহাদের স্বামিগণের অনুবর্ত্তিনী হইত। ইহাদের সমর-বাগ্মিগণের সাধারণ নাম "রাস্তি"। রাস্তিগণ লতা-বিশেষ দ্বারা কটিবন্ধন করিয়া, তীক্ষ্ণাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক আপন আপন সৈন্য-দিগকে নিম্নলিখিত বাক্যে উত্তেজিত করিতঃ—"তর-ঙ্গের ন্যায় প্রসারিত হও, সমুদ্র-তরঙ্গ যেমন প্রবল বেগে প্রবাল-প্রাচীর আঘাত করে, তোমরাও তেমন বেগের সহিত বিপক্ষকে আঘাত কর; বন্য কুকুরের

ন্যায় তোমাদের ক্রোধ প্রদীপ্ত হউক; ভাটার জলের ন্যায় শক্রগণ পলায়ন না করিলে, তোমরা প্রত্যাগত হইও না; শক্র নাশ কর, শক্র নাশ কর।” যুদ্ধে যাহারা বন্দী হইত, তাহারা হয় চিরদাস, নয় দেব-বলি হইত।

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গরেজদিগের সমুদ্র-পোত সকল, প্রথমে এই দ্বীপে উপনীত হয়। দ্বীপবাসিগণ জাহাজ ও কামান দেখিয়া, দেবতাজ্ঞানে আদর, ভয়, বিস্ময়ের সহিত ইঙ্গরেজদিগের অভ্যর্থনা করিয়াছিল। মিশনরিদের যত্নে ইহারা শিক্ষিত ও শিল্পকর্ম্মে নিপুণ হইতেছে। এখন অনেকে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং ইউরোপীয়দিগের আচারব্যবহারের অনুকরণ করিতে যত্নবান্ হইতেছে।

বজ্রপাতের আশঙ্কা।

বজ্রপাত বড় ভয়ঙ্কর ঘটনা। এই ভয়ঙ্কর ঘটনার নিবারণ জন্য বিভিন্ন প্রকার রীতি প্রচলিত আছে। সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, কতক গুলি বৈজ্ঞানিক নিয়মের বলে ঐ সকল রীতি জনসমাজে বদ্ধমূল হইয়া সাধারণের আস্থা ও আদর আকর্ষণ করিয়াছে।

বজ্রপাত তাড়িত প্রবাহমূলক। তাড়িত দুই প্রকার

যৌগিক ও বিয়োগিক * এই দ্বিবিধ তাড়িত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় পদার্থে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। যৌগিক ও বিয়োগিক তাড়িতের বিশেষ প্রকৃতি এই যে, উহাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি আছে; অর্থাৎ যে পদার্থে যৌগিক তাড়িত বর্ত্তমান থাকে, তাহার সমীপবর্ত্তী অন্য পদার্থে যদি বিয়োগিক তাড়িত অবস্থিতি করে, তাহা হইলে ঐ দুই প্রকার তাড়িতের একটির সহিত অপরটি মিলিত হইয়া যায়। কিন্তু দুই পদার্থে একই প্রকার তাড়িত বর্ত্তমান থাকিলে, ঐ স্বজাতীয়

* এক খণ্ড কাচ বা এক খণ্ড গালা, ফ্লানেল বা রেসমি রুমাল দিয়া ঘর্ষণ করিয়া, রেসমের সূত্রে লম্বিত কাগজখণ্ড, কাষ্ঠচূর্ণ, পালক প্রভৃতি লঘু বস্তু উহার নিকটে লইয়া গেলে দৃষ্ট হইবে যে, ঐ ঘর্ষিত স্থান উক্ত বস্তু সমূহকে আকর্ষণ করে, এবং ঐ সকল লঘু বস্তু উক্ত ঘর্ষিত স্থানে কিয়ৎক্ষণ সংলগ্ন থাকিয়া প্রতিক্ষিপ্ত হয়। এই আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ দ্বারা আমরা জানিতে পারি, ঘর্ষিত অংশ তাড়িতবিশিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কাচ ও গালার ঘর্ষিত অংশ হইতে বিভিন্নপ্রকৃতির তাড়িত উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ উল্লিখিত কোন লঘু বস্তুতে কাচের ঘর্ষিত অংশের তাড়িত প্রবেশ করাইয়া, উহা গালার ঘর্ষিত অংশের নিকট ধরিলে, গালার উক্ত ঘর্ষিত স্থান সেই বস্তুকে প্রতিক্ষিপ্ত করিবে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, এক খণ্ড কাচ রেসমি রুমাল দিয়া ও এক খণ্ড গালা ফ্লানেল দিয়া ঘর্ষণ করিলে, অল্প আয়াসে তাড়িত উৎপন্ন হয়। এই দুই প্রকার তাড়িত "যৌগিক" ও "বিয়োগিক" এই দুই পৃথক্ সংজ্ঞায় উক্ত হয়; অর্থাৎ প্রথমটিকে (কাচ হইতে উৎপন্ন) যৌগিক, দ্বিতীয়টিকে (গালা হইতে উৎপন্ন) বিয়োগিক বলা যায়। এই দুই প্রকার তাড়িতকে কেহ "পুষ্ট তাড়িত" ও "ক্ষীণ তাড়িত' কেহ 'পুরুষাকার" ও "স্ত্রী-আকার," কেহ বা "সহজ" ও "বিপরীত" তাড়িত কহেন। কিন্তু ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ গণিত-শাস্ত্র হইতে এই দ্বিবিধ তাড়িতের দুইটি সংজ্ঞা বাহির করিয়াছেন। আমরা এস্থলে উক্ত গণিত শাস্ত্রেরই অনুসরণ করিয়া "যৌগিক" ও "বিয়োগিক" নাম রাখিলাম।

তাড়িতবিশিষ্ট পদার্থদ্বয় পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, উভয়-বিধ তাড়িতেরই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম।

পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, মেঘে প্রায়ই যৌগিক তাড়িত বর্ত্তমান থাকে। যদি কোন মেঘে বিয়োগিক তাড়িত অবস্থিতি করে, তাহা হইলে ঐ উভয়বিধ তাড়িত পরস্পর সম্মিলিত হইয়া যায়। সম্মিলনসময়ে অতি উজ্জ্বল তাড়িত-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়; ইহাকেই আমরা 'বিদ্যুৎ' নামে নির্দ্দেশ করি। মেঘখণ্ড-স্থিত এই দ্বিবিধ তাড়িত এরূপ বেগে আসিয়া মিলিত হয় যে, উহার সংক্ষোভে মধ্য-বর্ত্তী বায়ু-রাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, এই বিক্ষেপণে যে ভয়ঙ্কর শব্দ হয়, তাহাকে মেঘগর্জ্জন" বা "বজ্রনির্ঘোষ" বলা যায়। বজ্রপাত উক্ত ভিন্নজাতীয় তাড়িতের সম্মিলন-ফল; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে উপরিস্থ মেঘের তাড়িত পৃথিবীর তাড়িতের সহিত মিলিতে চেষ্টা করিলে, মেঘের তাড়িত পৃথিবীর তদ্বিপরীত তাড়িতকে আকর্ষণ করিতে থাকে। এইরূপে পৃথিবীর তাড়িত মেঘের নিম্নস্থস্থানে একত্র হইলে

* যে কোন তাড়িতবিশিষ্ট পদার্থের নিকট অন্য কোন পদার্থ থাকিলে, এই শেষোক্ত পদার্থে, প্রথম পদার্থে যে তাড়িত আছে, তাহার বিপরীত তাড়িত প্রকাশ পায়। ইহাকে তাড়িতের সংক্রামণ বলে। এস্থলে মেঘের তাড়িতের সংক্রামণে পৃথিবীর তাড়িত মেঘের নিম্নস্থানে একত্র হয়।

মেঘের তাড়িত প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীর তাড়িতের সহিত মিলিত হয়; ইহাকেই 'বজ্রপাত' বলে।

এরূপ অনেকগুলি পদার্থ আছে যে, তৎসমুদয় দিয়া তাড়িত সহজে চালিত হইতে পারে। এই সমুদয় পদার্থকে 'তাড়িত-পরিচালক' নামে নির্দ্দেশ করা যায়। যে সকল পদার্থ দিয়া তাড়িত সহজে চালিত হইতে পারে না, সেই সকল পদার্থকে "তাড়িতাপরিচালক" বলা গিয়া থাকে। সকল প্রকার ধাতু, সমুদ্রের জল, বৃষ্টির জল, বরফ, সজীব উদ্ভিদ্, সজীব প্রাণী, আর্দ্র মৃত্তিকা ও প্রস্তর প্রভৃতি তাড়িতের উত্তম পরিচালক, এবং মোম, কাচ, হীরক, মণি, রেসম, পশম, শুষ্ক কাগজ প্রভৃতি তাড়িতের অপরিচালক। অপরিচালক পদার্থ তাড়িতপ্রসারণে নিয়ত বাধা দিয়া থাকে। এক খণ্ড ধাতু দিয়া তাড়িত পরিচালিত হইলে, সেই ধাতুর কোন ব্যত্যয় হয় না; কিন্তু এক খণ্ড কাচ তাড়িতপ্রবাহের পথে থাকিলে সেই কাচ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায় *। যে সকল পদার্থ তাড়িতের উত্তম পরিচালক, সেই সকল পদার্থ স্থানবিশেষে সুব্যবস্থিত করিয়া রাখিলে, বজ্রপাতের আশঙ্কা নিবারিত হইতে

* এই কারণে মনুষ্য প্রভৃতি সজীব প্রাণী বজ্রাহত হইলে, তাহার শরীরের কোন রূপ বিকার লক্ষিত হয় না, কেবল তাড়িতের প্রবেশ ও নির্গমনপথে এক একটি মাত্র চিহ্ন থাকে। সজীব প্রাণী তাড়িতপরিচালক; সুতরাং তাড়িত সহজেই উহার গাত্র ভেদ করিয়া চলিয়া যায়।

পারে। যেহেতু, পৃথিবীর বিয়োগিক তাড়িত ঐ সকল পরিচালক পদার্থ দিয়া শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া, মেঘের যৌগিক তাড়িতের সহিত সম্মিলিত হয়; সুতরাং মেঘস্থিত তাড়িতপ্রবাহ আর পৃথ্বীতলে উপস্থিত হইতে পারে না।

বজ্রপাত নিবারণ জন্য এখন সূক্ষ্মাগ্রভাগ লৌহদণ্ড আবাসগৃহের উপরিভাগে প্রোথিত রাখিবার রীতি সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। উহাকে বিদ্যুদ্দণ্ড কহে। আমেরিকার প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তর ফ্রাঙ্কলিন্ ঐ বিদ্যুদ্দণ্ড ব্যবহারের প্রণালী প্রথম উদ্ভাবন করেন। তাড়িত-পরিচালক লৌহদণ্ডের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হওয়াতে উপরিস্থ মেঘে যে যৌগিক তাড়িত বিমুক্তভাবে অবস্থিতি করে, তাহা পৃথিবীতে আসিতে না আসিতেই, পৃথিবীর বিয়োগিক তাড়িত উক্ত লৌহদণ্ডের সূক্ষ্মাগ্রভাগ দিয়া বহির্গত হইয়া, মেঘস্থিত তাড়িতের সহিত সম্মিলিত হয়। সুতরাং অবস্থান-গৃহে বজ্র পতিত হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন যে, এই জন্যই আমাদের দেশে দেবমন্দিরের উপরিভাগে লৌহ, তাম্র বা পিত্তলনির্ম্মিত সূক্ষ্মাগ্রভাগ ত্রিশূল ও চক্রস্থাপনের নিয়ম আছে। যে কারণে সূচ্যগ্র লৌহদণ্ড বজ্রাঘাত নিবারণ করে, ঠিক সেই কারণেই দেবমন্দিরে স্থাপিত ধাতব ত্রিশূল ও চক্র বজ্রপতনের ব্যাঘাত জন্মাইয়া

থাকে । পূর্ব্বে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের

* তাড়িতশাস্ত্রে হিন্দুদিগের যে জ্ঞান ছিল, প্রসঙ্গক্রমে এই স্থলে তাহার আর একটি প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। বঙ্গদেশের পূর্ব্ব প্রদেশে গ্রীষ্মকালে যে সকল শস্য জন্মে, তাহার অধিকাংশ শিলাবৃষ্টিতে বিনষ্ট হইয়া যায়, এজন্য এক ব্যক্তি এই শিলাবৃষ্টিনিবারণে নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাকে "শিলারি' কহে। শিলারি গ্রীষ্মকালের তিন চারি মাস সর্ব্বদা শুচি হইয়া শ্মশ্রুধারণ, অতৈলস্নান ও নিরামিষ ভোজন করে। যখন আকাশে শিলামেঘ দৃষ্ট হয়, তখন শিলারি আপনার কেশবন্ধন খুলিয়া, কপালে বড় সিন্দূর-কোটা, দক্ষিণ হস্তে একটি দীর্ঘাকার ত্রিশূল ও বাম হস্তে একটি মহিষশৃঙ্গনির্ম্মিত ভেরী ধারণ পূর্ব্বক প্রায় উলঙ্গভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, ভেরী বাদন করিতে করিতে শস্যক্ষেত্রে গমন করে। শিলারি শিলামেঘকে ক্ষেত্রের যে প্রান্তে দেখিতে পায়, সেই প্রান্তে গিয়া হস্তস্থিত ত্রিশূল ভূমিতে প্রোথিত করে এবং যতক্ষণ ঐ মেঘ ছিন্ন ভিন্ন ও চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে, ততক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, ভেরী বাজাইতে থাকে। মেঘ যদি বায়ুবেগে অন্য স্থান গমন করে, তাহা হইলে শিলারিও তাহার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া সেই মেঘের নিম্নভাগে ত্রিশূল প্রোথিত করে। শিলারির এইরূপ প্রক্রিয়াবলে প্রায়ই শস্যক্ষেত্রের উপরিস্থ মেঘের শিলাবর্ষণী শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়।

শিলারি যে উপায়ে মেঘের শিলা-বর্ষণী শক্তি বিনষ্ট করে, তাহা তাড়িত-বিজ্ঞান-মূলক ; শিলার উৎপত্তির কারণ তাড়িত। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, ভিন্ন জাতীয় তাড়িতবিশিষ্ট মেঘখণ্ডদ্বয় পরস্পর উর্দ্ধাধোভাবে থাকিলে এক মেঘের জলকণাসমূহ ভিন্ন জাতীয় তাড়িতের আকর্ষণে অন্য মেঘে যায়, এবং সেই মেঘের তাড়িত-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া, জলকণাসকল সংগ্রহ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ পুষ্টাবয়ব হইলে উহারা আবার তাড়িতের বিপ্রকর্ষণ ও আকর্ষণে পূর্ব্বতন মেঘে উপস্থিত হয় ; এই মেঘে যে জলকণা থাকে, তাহা দ্বারা আবার পুষ্টাবয়ব হইয়া মেঘান্তরে যায়। এইরূপে জলকণাসকল স্বজাতীয় ও বিজাতীয় তাড়িতে বিপ্রকর্ষণ ও আকর্ষণে পর্য্যায়ক্রমে মেঘ হইতে মেঘান্তরে যাইয়া, জমাট ও ভারি হইলে, মাধ্যাকর্ষণবলে পৃথিবীতে পতিত হয়। ইহাকেই শিলাবৃষ্টি কহে। যদি কোন উপায়ে একতর মেঘখণ্ড-স্থিত তাড়িতের আকর্ষণী শক্তি বিনষ্ট করা যায়, তাহা হইলে শিলার উৎপত্তি হইতে পারে না। শিলারির হস্তস্থিত ত্রিশূল অধিকতর তাড়িত-পরিচালক ; এজন্য পৃথিবীর তাড়িত উক্ত ত্রিশূলাগ্র হইতে উঠিয়া, মেঘস্থিত তাড়িতের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। এই সম্মিলনবশতঃ মেঘস্থিত তাড়িতের আর কোন কার্য্যকারিতা থাকে না। কার্য্যকারিতার অভাববশতঃ শিলারও উৎপত্তি

সংস্কার ছিল যে, মেঘস্থিত তাড়িত প্রোথিত লৌহ-শলাকার উপর পতিত হইয়া, ভূগর্ভে প্রবেশ করে, এজন্য কোন অনিষ্ট হয় না। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা লৌহদণ্ড গৃহের গাত্রসংলগ্ন না করিয়া কতিপয় অপরিচালক শুষ্ক কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা ভিত্তির সহিত আবদ্ধ করিয়া, গৃহের কিঞ্চিৎ অন্তরে প্রোথিত করিতেন। কিন্তু এখন বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, মেঘের তাড়িত লৌহ-শলাকায় আইসে না। পার্থিব তাড়িতই লৌহ-শলাকার সূচ্যগ্র ভাগ হইতে অল্প অল্প বিকীর্ণ হইয়া, মেঘের তাড়িতের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। সুতরাং লৌহশলাকাগুলি গৃহাদির গাত্রসংলগ্ন করিয়া রাখা হয়। উক্ত বিদ্যুদ্দণ্ড আবাস-গৃহের উপরিভাগ ভেদ করিয়া, মৃত্তিকায় প্রোথিত রাখা কর্ত্তব্য। ঐ লৌহ-দণ্ড বাটীর আয়তন বিশেষে ৬ কিংবা ১০ ফীট দীর্ঘ ও ছাদের উপরিভাগে ঠিক লম্বভাবে স্থাপিত হইবে। দণ্ডের অগ্রভাগ বিন্দুবৎ সূক্ষ্ম ও তাম্রনির্ম্মিত হওয়া উচিত, এবং অধোভাগের বেড় অন্যূন ৭ইঞ্চ থাকা আবশ্যক। এই প্রকার বিদ্যুদ্দণ্ডের দুইটি কার্য্যকারিতা আছে, একটি বজ্রপাত-নিবারণ, অপরটি যখন বজ্রপাত অনিবার্য্য হয়, তখন আবাস-গৃহ-রক্ষণ। বিন্দুবৎ

হইতে পারে না। শিলারির শ্মশ্রুধারণ, ভেরীবাদন প্রভৃতি বাহ্য আড়ম্বর মাত্র।

সূক্ষ্মাগ্রে তাড়িত অধিক ক্ষণ থাকিতে পারে না, উহা শীঘ্র শীঘ্র বিকীর্ণ হইয়া মেঘের যৌগিক তাড়িতের সহিত মিলিত হইয়া যায়। অধিকন্তু লৌহ অপেক্ষা তাম্র অধিকতর তাড়িত-পরিচালক; এজন্য তাম্র-নির্ম্মিত সূক্ষ্মাগ্র দিয়া অধিকতর সত্বরতার সহিত বিকী-রণকার্য্য সম্পন্ন হয়। মৃত্তিকা-প্রোথিত লৌহ-দণ্ড গৃহের ছাদ ভেদ করিয়া থাকাতে, মৃত্তিকা ও গৃহের তাড়িত, উভয়ই লৌহ-দণ্ড দিয়া যুগপৎ চারি দিকে বিকীর্ণ হয়, এবং মেঘের তাড়িতের সহিত সম্মিলিত হইয়া, উহাকে ক্রমে নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং আবাস-গৃহে বজ্রপতনের আশঙ্কা থাকে না। যদি ঘটনাক্রমে ভূমি ও গৃহের তাড়িত-প্রবাহ এত অধিক হয় যে, উহা শীঘ্র শীঘ্র লৌহদণ্ডের সূচ্যগ্রভাগ দিয়া বিকীর্ণ হইতে পারে না, তাহা হইলে মেঘের তাড়িতপ্রবাহ আসিয়া সেই দণ্ডে পতিত হয় এবং দণ্ডের পরিচালকতা গুণবশতঃ উহার অভ্যন্তর দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে; সুতরাং বজ্রপাত অনিবার্য্য হইলেও, বিদ্যুদ্দণ্ড সকল আবাস-গৃহ অক্ষুণ্ণ রাখে। সজীব বৃক্ষাদি যদিও তাড়ি-তের পরিচালক, তথাপি উহা বিন্দুবৎ সূচ্যগ্র নয় বলিয়া, শীঘ্র পৃথিবীর তাড়িত বিকীর্ণ করিতে পারে না। প্রত্যুত পরিচালকতা বশতঃ পৃথিবীর তাড়িত বৃক্ষে আসিয়া একত্র হইয়া, মেঘের তাড়িতের সহিত মিলিতে

চেষ্টা করে, এইজন্য বৃক্ষে সচরাচর বজ্রপাত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন কহেন, যে গৃহে বিদ্যুদ্দণ্ড সংযোজিত নাই, বৈদ্যুতিক উপদ্রবের সময়ে, সেই গৃহের অপর কোন স্থলে না থাকিয়া, মধ্যভাগে থাকা ভাল ; কারণ তাড়িত সচরাচর গৃহের প্রাচীর ভেদ করিয়াই প্রবাহিত হইয়া থাকে। গৃহের অভ্যন্তরে অধিক পরিমাণে ধাতুময় পদার্থ থাকিলে তৎসমুদয় বিদ্যুদ্দণ্ড হইতে দূরে রাখা বিধেয়। যদি গৃহের বহির্ভাগে অধিক পরিমাণে ধাতব পদার্থ থাকে, তাহা হইলে বিদ্যুদ্দণ্ডের সহিত সেই সকল পদার্থের সংযোগ থাকা আবশ্যক ; নচেৎ ঐ পদার্থসমূহে তাড়িতের আধিক্য বশতঃ তাড়িতপ্রবাহ সঞ্চালিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাড়িতপ্রবাহের এইরূপ সঞ্চালন আশঙ্কাতেই আমাদের দেশে বিদ্যুৎ-প্রকাশের সময়, ঘটী বাটী প্রভৃতি ঘরে তুলিবার নিয়ম আছে।

মেঘ হইতে মেঘান্তরে তাড়িতগমনের সময় যেমন আলোক ও শব্দ ইন্দ্রিয়-গোচর হয়, লৌহ-দণ্ড বা ত্রিশূলের অগ্রভাগ হইতে তাড়িতগমনের সময় সেরূপ আলোক ও শব্দ, কিছুই দর্শন ও শ্রবণ-পথে পতিত হয় না। যে কারণে এই বৈষম্য জন্মে, তাহা অতি সহজে বুঝা যায়। মেঘের প্রান্তভাগ স্থূল ও অপকৃষ্ট পরিচালক সুতরাং তাহা হইতে তাড়িত শীঘ্র শীঘ্র নির্গত

হয় না ; ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া যখন পরিমাণে অধিক হয়, তখনই উহা মেঘান্তরের তাড়িতের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। এইরূপে এককালে অধিক পরিমাণে তাড়িত বায়ু ভেদ করাতে আলোক ও শব্দ, উভয়ই উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে লৌহ-দণ্ড বা ত্রিশূলের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ও সুপরিচালক। এজন্য পৃথিবীর তাড়িত তাহাতে অধিক ক্ষণ থাকিতে পারে না ; অত্যল্প তাড়িত একত্র হইলেই, তাহা চারি দিকে বিকীর্ণ হইয়া, মেঘের তাড়িতের সহিত মিলিয়া যায়। সুতরাং আলোক বা শব্দ, কিছুই জানা যায় না।

কিয়দ্দূরে তাল, নারিকেল প্রভৃতি উচ্চ বৃক্ষ থাকিলেও, গৃহে বজ্রপতনের আশঙ্কা নিবারিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সজীব উদ্ভিদ্ তাড়িত-পরিচালক। এই পরিচালকতা গুণবশতঃ মেঘের তাড়িত-প্রবাহ বৃক্ষের উপর দিয়া যায়, সুতরাং গৃহাদির কোন অনিষ্ট হয় না। বৃক্ষ যে তাড়িত-পরিচালক, ইহা বোধ হয় আমাদের শাস্ত্রকারগণও জানিতেন। পূর্ব্বে আমাদের বাসগৃহের চারি দিকে নারিকেলাদি বৃক্ষ থাকাতেই বোধ হয়, তাঁহারা দেব-মন্দিরের ন্যায় বাস-গৃহের উপরিভাগে ত্রিশূলাদি প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা করেন নাই।

প্রাচীনদিগের মধ্যে বজ্রপাতের নিবারণ সম্বন্ধে

দুইটি সংস্কার ছিল, একটি জল দ্বারা বজ্রাগ্নির নির্ব্বাণ, অপরটি, ভূগর্ভে তাড়িতের প্রবেশাক্ষমতা। অনেকে এই প্রাচীন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, তাড়িতের আঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভূগর্ভে বাস করেন। জাপানে এই রীতি আছে। বৈদ্যুতিক উপদ্রব উপস্থিত হইলেই জাপানের অধিপতিগণ বজ্রপাতের আশঙ্কায় ভূগর্ভস্থ গৃহবিশেষে অবস্থিতি করেন। ঐ গৃহের উপরিভাগ জলপূর্ণ থাকে। তাড়িত ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে পারে না, এই সংস্কার ভ্রমাত্মক হইলেও দ্বিতল বা ত্রিতল গৃহ অপেক্ষা ভূগর্ভস্থিত গৃহে যে বজ্র-পাতের বড় আশঙ্কা থাকে না, তাহা পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন। অধিকন্তু জাপানের অধিপতিদিগের মধ্যে, ভূগর্ভস্থিত গৃহের উপরিভাগ জলপূর্ণ রাখিবার যে রীতি আছে, তাহার সহিত একটি গূঢ় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সংযোগ দৃষ্ট হয়। জল তাড়িতের উৎকৃষ্ট পরিচালক। পরিচালকতা প্রযুক্ত মেঘের যৌগিক তাড়িত জলে আসিলে, উহা সহজেই চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে; সুতরাং নিম্নস্থ পদার্থে আর সংক্ষোভ* লাগিতে পারে না। কিন্তু ইহাতে জলস্থিত মৎস্যাদি

* সচরাচর তাড়িতসংক্ষোভেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। নিকটে বজ্রপাত হইলে তাড়িতপ্রবাহ যদি দেহে উপনীত হয়, তাহা হইলে মৃত্যু সময়ে সময়ে অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

তাড়িতপ্রবাহ হইতে রক্ষা পায় না। জলে যদি কোন জীবিত প্রাণী থাকে, তাহা হইলে তাড়িতের সংক্ষোভে তৎসমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে কোন একটি হ্রদে বজ্রপাত হওয়াতে সেই হ্রদের সমুদয় মৎস্যই নষ্ট হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী অধিবাসিগণ ঐ সকল মৃত মৎস্য ৮ খানি গাড়ি বোঝাই করিয়া লইয়া যায়।

প্রাচীনকালে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, সিন্ধু-ঘোটক ও সর্পের চর্ম্ম বজ্র-নিবারক। রোমের সম্রাট অগস্তস্ এজন্য সিন্ধুঘোটকের-চর্ম্ম নির্ম্মিত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। রোমকগণ সিন্ধুঘোটকের চর্ম্ম-নির্ম্মিত তাম্বুও ব্যবহার করিত। ফ্রান্সের পর্ব্বত-বিশেষের পশুপালকগণ অদ্যাপি আপনাদের টুপি সর্প-চর্ম্মে আবৃত করিয়া থাকে। এই প্রক্রিয়া বজ্রপাতের প্রকৃত নিবারক কি না, তাহা আজ পর্য্যন্ত সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু কোন বিশেষ পদার্থ বা চর্ম্মের পরিচ্ছদ যে, সময়ে সময়ে বজ্রপাত নিবারণ করে, তাহা কেহ কেহ স্বীকার করিয়া থাকেন।

বৈদ্যুতিক মেঘাড়ম্বরের সময় ধাতু-নির্ম্মিত কোন গুরু পদার্থ গাত্রে সংলগ্ন রাখা উচিত নহে। শরীর ও ধাতু, উভয়ই তাড়িতের উৎকৃষ্ট পরিচালক; সুতরাং তাড়িত ধাতুময় পদার্থ দিয়া শরীরে প্রবাহিত হইতে পারে। এই তাড়িত-সংক্ষোভে প্রাণ বিনষ্ট হইবার

সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ জুলাই কোন একটি কারাগারের প্রশস্ত গৃহে কুড়ি জন কয়েদীর মধ্যে প্রধান কয়েদী লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। হঠাৎ সেই কারাগারে বজ্রপাত হইল। ইহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ কয়েদীর প্রাণ বিনষ্ট হয়, অপর কয়েক জন জীবিত থাকে। এ স্থলে ধাতব শৃঙ্খল দিয়া তাড়িতের গতি হওয়াতেই কয়েদী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গুরু-ভার ধাতব পদার্থই এইরূপ অনিষ্টের উৎপত্তি করে। অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ অঙ্গসংলগ্ন থাকিলে তাদৃশ বিপদের সম্ভাবনা নাই।

বজ্রপতনের আশঙ্কায় অনেকে এক স্থানে একত্র হইয়া, সাহসসংগ্রহের জন্য কথোপকথনে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা নিবারিত না হইয়া, বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এক স্থানে বহুসংখ্যক লোক অবস্থিতি করিলে, পরস্পারের ঘর্ম্ম প্রভৃতিতে সেই স্থানের বায়ু শীঘ্রই আর্দ্র হইয়া যায়। জলের ন্যায় আর্দ্র বায়ুও তাড়িতের উৎকৃষ্ট পরিচালক। এই আর্দ্র বায়ুতে তাড়িত একত্র হইলেই বিপদ ঘটিতে পারে।

ঝড়বৃষ্টির সময় প্রান্তরে অথবা অন্য কোন শূন্য স্থানে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। আকাশে ঘোরতর মেঘের আবির্ভাব ও তৎসঙ্গে ঝড়বৃষ্টি হইলে, প্রান্তরস্থিত ঘাসের উপর শুইয়া থাকা অনুচিত নয়।

এরূপ অবস্থায় মাথায় বজ্রপাতের অল্প সম্ভাবনা থাকে। যদি ঈদৃশ স্থলে দাঁড়াইয়া থাকা যায়, তাহা হইলে বজ্র-পাতের সম্ভাবনা থাকিলে, উচ্চতা প্রযুক্ত প্রান্তরস্থ ব্যক্তির মস্তকের উপরেই বজ্রপাত হইতে পারে। কিন্তু একবারে ঘাসের সহিত মিশিয়া থাকিলে, ততটা আশঙ্কা থাকে না। এরূপ স্থলে কেহ কেহ পথিক-দিগকে বায়ুর প্রতিকূল দিকে ধাবমান হইতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিক নিয়ম পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, উহার এই একটি কারণ অনুমিত হয়, প্রতিকূল দিকে ধাবমান হইলে, ধাবন-কারীর সম্মুখভাগের বায়ু-রাশি ঘনীভূত ও পশ্চাদ্ভাগের বায়ু লঘুতর হইয়া উঠে। সচরাচর ঘনীভূত বায়ু-পূর্ণ স্থান অপেক্ষা লঘুতর বায়ু-পূর্ণ স্থানেই বজ্রপাত হয়। যেহেতু ঘন বায়ুর ন্যায় লঘু বায়ু-রাশি তাড়িত-প্রবাহের গতি রোধ করিতে পারে না, সুতরাং লঘু বায়ু-পূর্ণ স্থানেই উহার গতি হইয়া থাকে। বজ্রপতনের সম্ভাবনা থাকিলে, এই নৈস-র্গিক নিয়মের বলে ধাবনকারীর পশ্চাদ্ভাগের ভূমিতেই উহা পতিত হয়। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে এই প্রক্রিয়া তাদৃশ ফলোপধায়িনী হয় না। দ্রুতগতিশীল বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় শকটের সম্বন্ধেই ইহার কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয় *। বৈদ্যুতিক উপদ্রবের সময় বৃক্ষতল আশ্রয়

* এ বিষয়ের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। একদা এক

করা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য। পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে, বৃক্ষ তাড়িতের উৎকৃষ্ট পরিচালক; বিশেষতঃ জলে সিক্ত হইলে, উহার পরিচালকতা শক্তি অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এজন্য বৃক্ষাদিতে বজ্রপতনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সুতরাং বৃক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরে থাকা সর্ব্বাংশে বিধেয়। ফ্রাঙ্কলিনের মতে ১৫ ফীট দূরে থাকিলে, অনিষ্টের তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না। হিন্‌লে নামক অন্য এক জন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত পাঁচ কিম্বা ছয় হাত অন্তরে থাকিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু যদি বৃক্ষাদি অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়, তাহা হইলে কিছু অধিক দূরে থাকাই পরামর্শ-সিদ্ধ। উন্নত বৃক্ষের ন্যায় বিদ্যুদ্দণ্ড-রহিত উন্নত গৃহের নিম্নভাগে থাকাও অনুচিত। সচরাচর সমুন্নত পদার্থেই বজ্রপাত হইয়া থাকে। কারণ, উচ্চতা হেতু উহা মেঘের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হয়। এই নিকটবর্ত্তিতাপ্রযুক্ত মেঘের ও সেই উন্নত পদার্থের তাড়িত শীঘ্র সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করে।

খানি অর্ণবপোত প্রচণ্ড বায়ুর প্রতিকূলে সবেগে চালিত হইতেছিল; ইহাতে পোতের সম্মুখ ভাগের বায়ু ঘনীভূত ও পশ্চাদ্ভাগের বায়ু লঘুতর হইয়া যায়। এই সময়ে হঠাৎ জাহাজের পশ্চাদ্ভাগের জলে বজ্রপাত হইল। বলা বাহুল্য, পশ্চাতের বায়ু লঘুতর হওয়াতেই ঐ স্থানে বজ্রপাত হইল; অন্যথা উহা জাহাজের গুণবৃক্ষ অথবা অন্য কোন উচ্চ স্থানে নিশ্চয়ই পতিত হইত।

শিষ্টাচার।

অশিষ্টকে কেহই আদর করে না। হাজার গুণ থাকিলেও অশিষ্ট ব্যক্তি লোকের নিকট নিন্দনীয় হইয়া থাকে। লোকসমাজে শিষ্টতার যেরূপ রীতি প্রচলিত আছে, ব্যবহারের সময় সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ রীতির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, অন্যথা কখনই লোকানুরাগ লাভ করিতে পারা যায় না। অসাধারণ কার্য্য দ্বারা প্রশংসা লাভ করা সকলের সুসাধ্য নহে, এবং সকল সময়ে সেই কার্য্যসম্পাদনের সুযোগও উপস্থিত হয় না। কিন্তু অভিবাদন, হস্তস্পর্শ, সপ্রণয় সম্ভাষণ ও অভিনন্দন দ্বারা লোকের হৃদয় আকর্ষণ করা সহজ ও সকলের ক্ষমতার আয়ত্ত। এই সকল বিষয়ে অবহেলা করিলে, লোকানুরাগ ও লোকখ্যাতিলাভ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কোন বিষয়ে কোন অসাধারণ গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তির শিষ্টাচারের ত্রুটি লক্ষিত হইলে, লোকে সেই ত্রুটি তত গ্রাহ্য করে না, কিন্তু সাধারণের ঐরূপ কোন ত্রুটি দেখিলে, তাহারা বড় বিরক্ত হইয়া উঠে।

শিক্ষকের নিকটে বা পুস্তকপাঠে এইরূপ শিষ্টাচার শিক্ষা হয় না। উহা শিখিতে হইলে, মনোযোগ পূর্ব্বক লোকব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যদি শিষ্ট

ব্যক্তির সহিত একত্র বাস ও সাধারণকে প্রীত করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে স্বভাবতই শিষ্টাচরণে প্রবৃত্তি জন্মে। যে শিষ্টাচরণে উপেক্ষা করে, তাহার সহিত কেহই শিষ্ট ব্যবহার করে না, সুতরাং সহজেই তাহার সম্মান নষ্ট হয়। অভ্যাগত ও বাহ্যাড়ম্বর-প্রিয় ব্যক্তি দিগের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহাদিগকে একবারে আকাশে তুলা উচিত নহে। এরূপ করিলে, লোকে তাহাকে স্তাবক ও মিথ্যাবাদী বলিয়া অবিশ্বাস করে।

অনেকে সামান্য শিষ্টাচরণে এরূপ কৌশল দেখায় যে, সহজেই লোকের হৃদয় গলিয়া যায়। যাঁহাদের সহিত কোন রূপ ঘনিষ্ঠতা বা গাঢ়তর প্রণয় নাই, আলাপের সময় তাঁহাদের গৌরব রক্ষা করিবে; অনুজীবীদিগের সহিত স্নিগ্ধ বন্ধুর ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিবে এবং গুণবিশেষে আদর দেখাইবে। সকলকেই অতিরিক্ত আদর করা মৃদুতা ও মূঢ়তার কার্য্য। অপরের চিত্ত-রঞ্জনের সময় আপনারও মানসম্ভ্রমের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইলে, সেই পরামর্শের ঔচিত্য সম্বন্ধে আপনারও মত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা দূষণীয়। তুচ্ছ শিষ্টাচারের অনুরোধে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যাঘাত করা, মূঢ়তার পরি-

চায়ক। অধিকন্তু যেখানে শিষ্টতা রক্ষা করিলে, নিজের ও পরের অনিষ্ট ঘটিতে পারে, সেখানে শিষ্ট ব্যবহার করা অশিষ্টের কর্ম্ম।

ভারত-মহিলার দয়া ও প্রভু-ভক্তি।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহি-যুদ্ধের সময় যখন চারি দিকে ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হয়, নর-শোণিত-স্রোতে ভারতবর্ষের অনেকস্থান যখন রঞ্জিত হইয়া যায়, যুদ্ধো-ন্মত্ত সিপাহিগণ যখন ইঙ্গরেজকুল ধ্বংস করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া, ইঙ্গরেজ-শিশু প্রভৃতিকে নির্দ্দয়রূপে হত্যা করে, তখন আমাদের দেশের কতিপয় অসহায় রমণী অবিচলিত সাহসের সহিত যেরূপ অসাধারণ দয়া ও প্রভু-ভক্তির পরিচয় দেন, এস্থলে তাহার বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

ফৈজাবাদের ডেপুটী কমিশনর কাছারিতে গিয়া শুনিলেন, নিকটবর্ত্তী সেনা-নিবাসের সিপাহিগণ যুদ্ধো-ন্মুখ হইয়াছে। তিনি এই সংবাদ শুনিবামাত্র একজন বিশ্বস্ত চাপরাসী দ্বারা, আপনার স্ত্রীকে, অবিলম্বে সমু-দয় সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নদীতটে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন। এই চাপরাসী তাঁহার স্ত্রীর সহিত যাইবার

জন্যও আদিষ্ট হইল। সহধর্ম্মিণীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়া ডেপুটী কমিশনর কার্য্যানুরোধে সেনা-নিবাসে গমন করিলেন। এদিকে কমিশনরের পত্নী শিবিকা-রোহণে বিশ্বস্ত ভৃত্যের সঙ্গে নদীকুলের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সিপাহিগণ এই সময়ে সম্পত্তি-লুণ্ঠন ও ইঙ্গরেজ-বিনাশের নিমিত্ত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভীতা ও অসহায়া ইংরেজ-মহিলা সন্ধ্যাসমাগমে কোন একটি পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। একটি দয়াশীলা পল্লীবাসিনী আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, তাঁহাকে স্বীয় গৃহে আশ্রয় দিয়া;একটি অব্যব-হার্য্য তুন্দুরের ভিতরে লুকাইয়া রাখিল। বাহকগণ এদিকে শিবিকা নদীকুলে রাখিয়া প্রস্থান করিল। কমিশনরের পত্নী ভয়-বিহ্বলচিত্তে সমস্ত রাত্রি সেই তুন্দু-রের ভিতর লুক্কায়িত রহিলেন। রাত্রিকালে সিপাহিরা উক্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া, চারি দিকে পলায়িত ইঙ্গ-রেজ পুরুষ ও স্ত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং পলা-য়িত ও আশ্রিতদিগকে বাহির করিয়া না দিলে, প্রাণ-সংহার করা হইবে বলিয়া সকলকে ভয় দেখাইতে লাগিল। আপনার জীবন হানির সম্ভাবনা জানিয়াও কোমল-হৃদয়া আশ্রয়দাত্রী নিরাশ্রয়া ইঙ্গরেজ মহিলাকে উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তে সমর্পণ করিল না। যখন ঐ ইঙ্গরেজ-রমণী গ্রামে প্রবেশ করেন, তখন

গ্রামের পুরুষেরা কৃষি-ক্ষেত্রের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, সুতরাং তাহাদের অনেকে ঐ বিষয় অবগত ছিল না। কিন্তু গ্রামবাসিনী অধিকাংশ মহিলাই ঐ নিগূঢ় তত্ত্ব জানিত, তথাপি তাঁহাদের কেহই উহা প্রকাশ করিল না। ভয়ব্যাকুলা বিদেশিনী দরিদ্র আশ্রয়দাত্রীর অনুগ্রহে তুন্দুরের অভ্যন্তরে নীরবে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। ক্রমে ভয়াবহ কোলাহল নিবৃত্ত হইল, সিপাহিগণ স্থানান্তরে চলিয়া গেল, ভয়ঙ্করী রাত্রি প্রভাত হইলে, ডেপুটী কমিশনরের পূর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য সেই স্থানের সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ভুস্বামী মহারাজ মানসিংহের নিকট যাইয়া, একখানি নৌকা প্রার্থনা করিল। দয়ার্দ্র মানসিংহ বিপন্নের উদ্ধারার্থ ভৃত্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ডেপুটী কমিশনরের পত্নী ও অপর কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা আপনাদের সন্তানবর্গের সহিত নৌকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। বাহিরে সমভিব্যাহারী কতিপয় বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সিপাহি বসিয়া রহিল, এবং এখানি তীর্থ-যাত্রীর নৌকা বলিয়া সাধারণের নিকট ভাণ করিতে লাগিল। দুই একস্থানে ইহাদের সহিত উত্তেজিত সিপাহিদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু নৌকার ভিতরে পলাতক ইউরোপীয় আছে; ইহা সিপাহিগণ বুঝিতে পারে নাই। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে নৌকা কোন নিরাপদ স্থানে লাগাইয়া, কয়েক

জন ভৃত্য দুগ্ধ ও রুটীর জন্য নিকটবর্ত্তী পল্লীতে গমন করিল। এস্থানেও পল্লীবাসিগণ বিপন্ন পলাতকদিগকে সহায্যদানে কাতর হইল না। একটি দয়াবতী রমণী শিশুগুলিকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া দ্রুত-গতি গ্রামে প্রবেশ করিল, এবং কয়েকটি দুগ্ধবতী ধাত্রী সঙ্গে করিয়া নৌকার নিকট উপস্থিত হইল। ইউরোপীয় মহিলাগণ আহ্লাদ-সহকারে ইহাদিগকে গ্রহণ করিলেন; ইহারা আপনাদের স্তন্যদানে শিশুদিগকে পরিতৃপ্ত করিল। সিপাহিগণ জানিতে পারিলে এই আশ্রয়দাত্রী ও সাহায্য-কারিণী মহিলাদিগের প্রাণসংহার করিত। আপনাদের জীবন এইরূপ সংশয়াপন্ন করিয়াও উক্ত দয়াবতী রমণীগণ বিপন্নদিগের যথাসাধ্য সাহায্য করে। এইরূপ সাহায্য পাইয়া ইউরোপীয় কুলকামিনীগণ নিরাপদে এলাহাবাদে উপনীত হন। ডেপুটী কমিশনর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই মহদুপকার বিস্মৃত হন নাই। যুদ্ধের অবসান হইলে ইঁহারা উক্ত সদাশয়া মহিলাদিগকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

আর একটি ভারত-মহিলা সিপাহি-যুদ্ধের সময় অবিচলিত বিশ্বাস, অটল সাহস ও অসামান্য প্রভু-ভক্তির পরিচয় দেয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই মহিলা অযোধ্যায় এক জন ইঙ্গ্‌রেজ সেনাপতির পরিবার মধ্যে ধাত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। সেনাপতি আপনার

সন্তানদিগকে ইঙ্গ্লণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন, কেবল একটি কুড়ি মাসের শিশু তাঁহার ও তদীয় স্ত্রীর নিকটে ছিল। যুদ্ধের সময়ে উক্ত ধাত্রীর প্রতি এই শিশুটির প্রতিপালনভার সমর্পিত হয়। একদা প্রাতঃকালে ধাত্রী প্রচলিত রীতি অনুসারে শিশুটিকে লইয়া ভ্রমণ করিতেছিল,এমন সময়ে চারিদিকে উত্তেজিত সিপাহিদিগের ভয়ঙ্কর কলরব শুনিতে পাইল। কোলাহলশ্রবণে সে দ্রুতবেগে গৃহে আসিয়া জানিতে পারিল, সিপাহিগণ সম্পত্তি লুঠিয়া লইতেছে, এবং ইউরোপীয় বালক, বৃদ্ধ, বনিতা, সকলকেই মৃত্যু-মুখে পাতিত করিতেছে। স্নেহময়ী ধাত্রী শিশুটিকে স্থানান্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিবার আর সময় পাইল না; আপনার বস্ত্রে তাড়াতাড়ি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া, গৃহের এক প্রান্তে চাপিয়া রাখিল, এবং সাহসে ভর করিয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সিপাহিরা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ধাত্রীকে কহিল, "আমরা বিদেশীয় যুবক, বৃদ্ধ সকলকেই বধ করিব, শিশুটি কোথায় আছে, শীঘ্র বাহির করিয়া দাও।" ধাত্রী শিশুর সম্বন্ধে বাঙ্নিষ্পত্তি করিল না, কেবল আপনার সম্বন্ধে দয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। সিপাহিগণ এই প্রার্থনায় সম্মত হইল না, কহিল, "বালকটিকে বাহির করিয়া না দিলে নিশ্চয়ই তোমাকে দণ্ড গ্রহণ

করিতে হইবে।” অসহায় ও বিপন্ন সন্তান ধাত্রীর পশ্চাদ্ভাগে বস্ত্রাচ্ছাদিত ছিল। ধাত্রী ইচ্ছা করিলেই তাহাকে সিপাহিদের হস্তে সমর্পণ করিয়া, আপনাকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু অনুপম হিতৈষিতা তাহাকে এই নৃশংস কার্য্য হইতে বিরত করিল। ধাত্রী শিশুর সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না; কেবল পূর্ব্বের ন্যায় আপনার জন্য করুণা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

এক জন সিপাহি জিজ্ঞাস্য বিষয়ে ধাত্রীকে নিরুত্তর দেখিয়া, সক্রোধে তাহার বাহুতে তরবারির আঘাত করিল, আহত স্থান হইতে রক্ত-ধারা অনর্গল নির্গত হইতে লাগিল। ধাত্রী নীরবে এই আঘাত সহ্য করিল; রক্ষাধীন বালক কোথায় আছে, কহিল না। ঘাতকের উত্তোলিত অসি উপর্য্যুপরি তাহার দেহে পতিত হইতে লাগিল, অসহায় অবলা কেবল আপনার বাহু দ্বারা তরবারির নিদারুণ আঘাত হইতে মস্তক রক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার সমস্ত দেহ ক্ষত-বিক্ষত ও রুধিরে প্লাবিত হইয়া উঠিল; অবলা আর সহিতে পারিল না, হতচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িল। এদিকে সিপাহিরা লুণ্ঠনাশয়ে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল; স্নেহময়ী ধাত্রীর প্রাণাধিক স্নেহের ধন রক্ষাকারিণীর পার্শ্বে নিরাপদে বস্ত্রাচ্ছাদিত রহিল।

ধাত্রী সংজ্ঞা লাভ করিয়া, শিশুটিকে লইয়া আপনার বাটীতে উপস্থিত হইল, এবং লোকে ইঙ্গরেজ-বালক বলিয়া মনে করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে উহার গাত্রে এক প্রকার রং মাখাইয়া দিল। কিছু দিন পরে, সে শুনিতে পাইল, তাহার প্রভু ও প্রভু-পত্নী উভয়েই লক্ষ্ণৌ নগরে আছেন। এই সংবাদ শুনিয়া বিশ্বস্তা পরিচারিকা, শিশুটিকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং প্রীতিপ্রফুল্ল-হৃদয়ে প্রভু ও প্রভু-পত্নীর হস্তে তাঁহাদের হৃদয়-রঞ্জন স্নেহের পুত্তলী সমর্পণ করিল। সেনাপতি ও তাঁহার বনিতা অহ্লাদ ও কৃতজ্ঞতার সহিত শিশুটিকে গ্রহণ পূর্ব্বক, শান্তি স্থাপিত হইলে ধাত্রীকে সমুচিত পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

আহতস্থান ভালরূপে শুষ্ক না হওয়াতে, ধাত্রী লক্ষ্ণৌ হইতে আপনার বাসগ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হয়। যত দিন সিপাহিরা লক্ষ্ণৌ অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল, তত দিন, সে, ঐ স্থানেই অবস্থিতি করে। ইহার পরে উক্ত নগর শত্রুর আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইলে, ধাত্রী অনুসন্ধান করিয়া জানিল, তাহার প্রভু ও প্রভু-পত্নী, উভয়েই আক্রমণের সময়ে হত হইয়াছেন। যাহাকে সে শরীরের শোণিতপাত করিয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল, এবং অপরিসীম সাহস ও দৃঢ়তার সহিত

লুক্কায়িত রাখিয়াছিল, সে অপরাপর অনাথ শিশু সন্তানের সহিত ইঙ্গলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সদাশয়া মহিলা অযোধ্যার ডেপুটি কমিশনরের গৃহে ধাত্রীর কার্য্যে নিয়োজিত ছিল। অনেকেই তাহার নিকটে উক্ত ঘটনার বিবরণ শুনিয়াছেন, এবং অনেকেই তাহার শরীরের ক্ষত স্থান দর্শন করিয়াছেন। ঐ ক্ষতগুলি তাহার অসীম সাহস, অবিচলিত প্রভু-ভক্তি, অপরিমেয় বিশ্বাস ও অলৌকিক দয়ার গৌরবসূচক অমূল্য ভুষণস্বরূপ ছিল। এই গৌরব-কাহিনী বলিবার সময়ে তাহার মুখমণ্ডলে কোন প্রকার গর্ব্বের চিহ্ন লক্ষিত হইত না। জিজ্ঞাসা করিলে, সে নিরতিশয় বিনীতভাবে সকলের নিকটে উহা ব্যক্ত করিত।

সিপাহি-যুদ্ধের সময়ে সকলেই আপন আপন সম্পত্তি রক্ষা করিতে ব্যস্ত ছিল। এ বিষয়ে একটি দরিদ্র মহিলা যেরূপ অটল বিশ্বাস ও প্রভু-ভক্তি দেখায়, তাহা সুনীতি, সদভিপ্রায় ও সাধুচরিত্রের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। সেই দুঃসময়ে সকলে যখন কেবল আপনার বিষয় লইয়া বিব্রত ছিল, তখন বিশ্বস্তা বামনী পরের বিষয়ের জন্য যত্নবতী হইয়া উঠে।

বামনী একজন ইঙ্গ্রেজ ডাক্তরের পরিচারিকা। ডাক্তর সিপাহি-যুদ্ধের সময়ে অযোধ্যাস্থিত সৈনিক-

নিবাসে চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদা নিশীথ সময়ে সংবাদ আসিল, অযোধ্যার সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তর কার্য্যানুরোধে স্বয়ং পলাইতে পারিলেন না, কেবল তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে তিনটি শিশু সন্তানের সহিত অবিলম্বে শকটারোহণে লক্ষ্ণৌ যাইতে পরামর্শ দিলেন। চিকিৎসক-পত্নী সম্মুখে যাহা পাইলেন, তৎসমুদয় তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠাইয়া, সন্তান-ত্রয়ের সহিত লক্ষ্ণৌ নগরের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে ডাক্তর, অপরাপর ইঙ্গ্‌-রেজেরা যেখানে আত্মরক্ষার্থ সজ্জিত ছিলেন, সেই খানে উপনীত হইলেন। চারি দিকে সিপাহিদিগের ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইল; ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহ সকল দগ্ধ হইতে লাগিল; গভীর নিশীথে ভয়ঙ্করী অনলশিখা দ্বিগুণ উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল। চিকিৎসক-রমণী তিনটি সন্তান ও দুইটি বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত সভয়ে এই ভয়ঙ্কর সময়ে রাজপথ অতিবাহন করিয়া লক্ষ্ণৌ গমন করিলেন। চিকিৎসক দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু আর গৃহে গমন করিলেন না, অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের সহিত সিপাহি-গণের আক্রমণ নিরস্ত করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে বামনী প্রভুর পরিত্যক্ত গৃহে নিষ্কর্ম্মা ছিল না। তাহার প্রভুপত্নী যেখানে অলঙ্কারাদি বহুমূল্য

সম্পত্তি রাখিতেন, তাহা সে জানিত, এখন কালবিলম্ব না করিয়া, সেই সমস্ত মূল্যবান্ আভরণ-রাশি সংগ্রহ পূর্ব্বক, গৃহ হইতে বহির্গত হইল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সিপাহিগণ আসিয়া সেই গৃহে অগ্নি প্রদান করিল। চিকিৎসক দূর হইতে দেখিলেন, তাঁহার গৃহ করাল অনল-শিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বামনী যে, সমস্ত অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। সুতরাং সে ইচ্ছা করিলেই, ঐ সমস্ত মহামূল্য দ্রব্য আত্মসাৎ করিতে পারিত। আভরণ-গুলি বিক্রয় করিলে যে টাকা লাভ হইত, তাহা বামনী আপনার জীবিতকালমধ্যে কখনও উপার্জ্জন করিতে পারিত না। কিন্তু প্রভু-পরায়ণা বিশ্বস্তা অবলা এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল না। সাধুতা ও প্রভুভক্তির সম্মান তাহার নিকটে উচ্চতর বোধ হইল। দরিদ্রা বামনী অবলীলায় লোভ সম্বরণ করিয়া, প্রভু-পত্নীর সমস্ত দ্রব্য সযত্নে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

নগরের নিকটে সামান্য পল্লীতে বামনীর আবাস-বাটী ছিল। বামনী আপনার গৃহে আসিয়া, একখানি ফ্লানেলের কাপড়ে আভরণগুলি জড়াইয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিল। সে কেবল আপনার উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, আপনার ন্যায় আত্মীয়দিগকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই, সুতরাং

তাহাদের নিকটে এ বিষয় ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিল না। এক বৎসরেরও অধিক কাল এই ভাবে গত হইল; এক বৎসরেরও অধিক কাল চিকিৎসক-পত্নীর বহুমূল্য সম্পত্তি বিশ্বস্তা বামনীর কুটীরে মৃত্তিকার নীচে রহিল। শেষে লক্ষ্ণৌ শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইল, শান্তি পুনঃ স্থাপিত হইল, এবং সুখ-সমৃদ্ধিতে অযোধ্যা পুনর্ব্বার শোভিত হইয়া উঠিল। চিকিৎসক আর এক সেনা-নিবাসে চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বামনী এই সংবাদ শুনিয়া তথায় গমন করিল, এবং প্রভু ও প্রভু-পত্নীর অস্তিত্বসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য অন্তরাল হইতে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিল। যখন আর কোন সন্দেহ রহিল না, তখন সে নীরবে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগমন করিল, নীরবে মৃত্তিকা হইতে সমস্ত আভরণ বাহির করিল এবং নীরবে ও সাবধানে তৎসমুদয় সঙ্গে লইয়া, পুনর্ব্বার প্রভুপত্নীর নিকটে সমাগত হইল। বামনী অক্ষতশরীরে প্রত্যাগত হইয়াছে দেখিয়া, চিকিৎসক ও তাঁহার পত্নী বিস্মিত হইলেন, পরে যখন দেখিলেন, বামনী তাঁহাদের পরিত্যক্ত সমুদয় বহুমূল্য আভরণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না। দরিদ্র পরিচারিকা বিনম্রভাবে একে একে সমস্ত

অলঙ্কার বুঝাইয়া দিল। চিকিৎসক ও তাঁহার স্ত্রী দেখিলেন, অলঙ্কারাদির কিছুই অপহৃত হয় নাই। তাঁহারা পরিচারিকার এই অসাধারণ সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ, দ্বিগুণ বেতনে তাহাকে পুনরায় কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। বামনী এইরূপে প্রভু-পরিবারের বিশ্বাস-ভাজন হইয়া, পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

সিপাহি-যুদ্ধের সময়ে কেবল যে, নিম্নশ্রেণীর স্ত্রী-লোকেরাই সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছে, তাহা নহে। সম্ভ্রান্ত হিন্দুমহিলাগণও আপনাদের স্বভাব-সিদ্ধ সাধুতা ও উদারতার বশবর্ত্তী হইয়া, অসহায় ইউরোপীয়দিগকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। বুঁদীর রাজার ধর্ম্ম-পরায়ণা বনিতা এই শ্রেণীর রমণীগণের অগ্রগণ্যা। বুঁদীরাজ সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এ দিকে তাঁহার দয়াশীলা পত্নী শুনিতে পাইলেন, ইউরোপীয়গণ দলে দলে নিহত হই-তেছে, যে সকল কুল-কন্যা ও শিশু সন্তান এক সময়ে সুখসৌভাগ্যের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছিল, তাহারা এখন খাদ্যবিহীন ও বস্ত্রবিহীন হইয়া, আশ্রয়-স্থানের অভাবে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিমের মধ্যে নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে পড়িয়া রহিয়াছে। এই শোচ-নীয় দুর্গতির সংবাদে কামিনীর কোমল হৃদয় দয়াদ্র

হইল। বুঁদীর অধীশ্বরী স্বামীর অজ্ঞাতসারে বিশ্বস্ত লোকদ্বারা নিজ ব্যয়ে অরণ্যস্থিত নিরাশ্রয় ইউরোপীয়-দিগের নিকটে আহার্য্য ও পরিধেয় পাঠাইতে লাগিলেন। এই সঙ্গে পাদুকা প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যও প্রেরিত হইতে লাগিল। বুঁদীর অধিপতি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং শত্রু-পক্ষের প্রতি পত্নীর এই সদ্ব্যবহার তাঁহার গোচর হইল না। রাজমহিষীর সাহায্যে নিরাশ্রয় ইউরোপীয়গণ সুস্থ শরীরে দিল্লী-স্থিত ইঙ্গ্রেজ সেনানিবাসে উপস্থিত হইল। রাণী যথাসময়ে সাহায্য না করিলে, ইহাদের অনেকের প্রাণ নষ্ট হইত। এইরূপ সাহায্যদানে যে, আপনার প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে, তাহা রাণী জানিতেন। কিন্তু তাহা জানিয়াও তিনি হৃদয়ের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন না। হিতৈষিণী নারী বিপন্নের সাহায্য করিয়া হিতৈষিতার গৌরব রক্ষা করিলেন। কিন্তু এই হিতৈষিতা, সদাশয়তা ও উদার-তাই রাণীর জীবন-নাশের কারণ হইল। বুঁদীরাজের প্রত্যাগমনের কিছু কাল পরে রাণীর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে রাজাও ইঙ্গ্রেজ সেনাপতি স্যার্ হিউ রোজের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। কি কারণে রাণীর হঠাৎ মৃত্যু হইল, তাহা ভালরূপে জানা যায় নাই। অনেকে সন্দেহ করেন, বুঁদীর অরণ্য-স্থিত অসহায় ইউরোপীয়দিগের সাহায্য করাতে, রাজার

আদেশক্রমে রাণীকে বধ করা হয়। কেহ কেহ কহেন, রাজা নিজ হস্তেই পত্নীর প্রাণ সংহার করেন।

এই স্থলে ভারতমহিলার অসাধারণ দয়া ও স্বার্থ-ত্যাগের আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ইহা একটি নীচজাতীয়া দরিদ্রা হিন্দু-রমণীর বিবরণ। যখন সিপাহিরা কাণপুর অবরোধ করে, তখন এই রমণীর প্রতি দুই বৎসরের একটি ফিরিঙ্গি-সন্তানের রক্ষার ভার ছিল। সন্তানের পিতামাতা, উভয়েই অবরোধের সময়ে নিহত হইয়াছিল, কেবল এই দরিদ্রা স্ত্রীই শিশুর একমাত্র অভিভাবক ছিল; দুঃখিনী ধাত্রী শিশুটিকে তাহার জন্মা-বধি প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছিল। সুতরাং তাহাকে সে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিত। পিতৃ-মাতৃ-হীন দুঃখী সন্তান, কেবল এই দুঃখিনী নারীর অনু-পম স্নেহে রক্ষিত হইতেছিল।

ক্রমে কাণপুরের অবরোধ-কার্য্য শেষ হইয়া আসিল। সিপাহিদিগকে প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া, জুন মাসের শেষে ইঙ্গ্‌রেজ সেনাপতি এই নিয়মে নানা সাহেবের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন যে, ইউরোপীয় মহিলা ও বালক বালিকাদিগের সহিত তাঁহার সৈন্যগণ নৌকারোহণে স্থানান্তরে গমন করিবে, সিপাহিরা তাহাদের কোন বিঘ্ন জন্মাইবে না। নানা সাহেব ইহাতে সম্মত হইলেন। অবরুদ্ধ কামিনীগণ বিমুক্তির

সংবাদে প্রফুল্ল হইয়া, নৌকায় আরোহণ করিবার জন্য সজ্জিত হইতে লাগিলেন।

ফিরিঙ্গি-সন্তানের প্রতিপালিকা ধাত্রীও সজ্জিত হইল এবং হৃষ্টচিত্তে শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া, আপনার পঞ্চদশ বৎসর-বয়স্ক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, নদীকূলে গমন করিল। সকলে নৌকায় আরোহণ করিয়াছে, এমন সময়ে সিপাহীরা তট-দেশ হইতে আরোহীদিগকে লক্ষ্য করিয়া, বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। দুইটি কামান নদীতটে লুক্কায়িত ছিল, এখন তাহা বাহির করিয়া নৌকার সম্মুখবর্ত্তী করা হইল। ধাত্রী উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শিশু সন্তানটিকে বক্ষঃস্থলে চাপিয়া রাখিয়া, পুত্রের সহিত সিঁড়ীতে নামিল, এবং ঐ সিঁড়ী দিয়া সবেগে তীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভীষণ কামান-ধ্বনি ও কৃতান্তসহচর সিপাহিদিগের কলরব-মধ্যে অসহায় রমণী দুইটি সন্তান লইয়া, প্রাণভয়ে তটদেশ লক্ষ্য করিয়া, দৌড়িতে আরম্ভ করিল; কিন্তু দুঃখিনী পরিত্রাণ পাইল না। তীরে সিপাহিগণ নিষ্কোষিত অসি হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। ধাত্রী যেই তটদেশে উপনীত হইয়াছে, অমনি তাহাদের এক জন দক্ষিণ হস্তে অসি উত্তোলন করিয়া, ফিরিঙ্গি-সন্তানকে ধরিবার জন্য বাম হস্ত প্রসারণ করিল। স্নেহময়ী নারী নরঘাতকের হস্তে শিশুটিকে সমর্পণ করিল না, নিজের

অঙ্গাচ্ছাদন দ্বারা তাহাকে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া, বাহুদেশ-মধ্যে চাপিয়া রাখিল।

নরহন্তা সিপাহি অসি আস্ফালন করিয়া, তীব্রভাবে কহিল, "বালকটিকে হাতে দাও। তোমার শরীর অক্ষত থাকিবে।

তেজস্বিনী ধাত্রী গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "আমি কখনই আমার সন্তানকে তোমার হাতে দিব না। ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া আমাদের উভয়কেই দয়া কর।

"বালককে সমর্পণ না করিলে দয়ার প্রত্যাশা নাই সিপাহি সরোষে ইহা কহিয়া, পুনরায় হস্ত প্রসারণ করিল। কিন্তু ধাত্রী দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, ছাড়িয়া দিল না।

ধাত্রীর পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্র নিকটে ছিল। সে কাতর স্বরে কহিল, "মা! শিশুটিকে দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা কর।"

পুত্রের কাতর প্রার্থনায় দয়াবতী রমণী আপনার প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিত হইল না; নির্ভয়ে অটল সাহসে উত্তর করিল, "না, তাহা কখনই হইবে না।"

এই কথা বলিবামাত্র ঘাতকের উত্তোলিত অসি সবেগে তাহার মস্তকে নিপতিত হইল, দারুণ আঘাতে মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। ধাত্রী অচৈতন্য হইয়া ধরা-

শায়িনী হইল। আর তাহার চৈতন্য হইল না। অভাগিনী অবলা পিতৃমাতৃহীন শিশুর জন্য নীরবে ধীরভাবে আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

নিষ্ঠুর সিপাহি ফিরিঙ্গি-শিশুটিকে বধ করিল। এক মাত্র ধাত্রীপুত্রের প্রাণ রক্ষা পাইল। সিপাহি তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করিল না।

এই ঘটনার চারি বৎসর পরে, পূর্ব্বোক্ত ধাত্রীর পুত্র অযোধ্যায় উপনীত হয়। জননীর মৃত্যুর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, সে কহিত, "মা আমার কথা শুনিলে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেন, ফিরিঙ্গি-শিশুকে বাঁচাইতে যাইয়া, উভয়েই হত হইলেন।

উল্লিখিত ঘটনাগুলি উদারতা, সাধুতা ও নিঃস্বার্থ হিতৈষিতার প্রধান পরিচয়-স্থল। ভারতের অবলাগণ এক সময়ে এইরূপ উদারতা, সাধুতা ও হিতৈষিতা দেখাইয়া, পৃথিবীতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। অনেক পুরুষ ইহাঁদের ন্যায় এইরূপ দেবভাবের পরিচয় দিতে পারেন নাই। যাঁহারা পরোপকারের জন্য আত্ম-প্রাণ উৎসর্গ করেন, তাঁহাদের সহিত কোন পার্থিব পদার্থের তুলনা হয় না। ভারত-মহিলার এই মধুর দেবপ্রকৃতি পৃথিবীর স্ত্রী পুরুষ, সকলের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

মেরুজ্যোতিঃ।

বিশাল বিশ্বরাজ্যের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই প্রকৃতির কৌশলময় কার্য্য অনুপম শক্তি বিকাশ করিয়া, জীবলোকের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। এস্থলে মেরুজ্যোতিঃ নামে যে আলোকের বিষয় বিবৃত হইতেছে, তাহাতেও প্রকৃতির কৌশলময় কার্য্য ও মঙ্গলময় ভাব পরিস্ফুট হইবে।

পৃথিবীর সকল স্থানে ঠিক এক সময়ে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয় না। সূর্য্য যখন পূর্ব্বদিক লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া, আমাদের নিকটে প্রকাশিত হয়, তখন অন্য ভূখণ্ড নিশীথকালের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ-প্রান্তস্থিত প্রদেশ-দ্বয়ে সূর্য্যের উদয়াস্তের সম্বন্ধে বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। আমাদের দেশের ন্যায় সেই দেশে প্রতিদিন সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয় না; অর্থাৎ আমরা যেমন প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় একবার দিবা ও একবার রাত্রি ভোগ করি, সুমেরু ও কুমেরুমণ্ডলের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসীদিগের ভাগ্যে তেমন ঘটিয়া উঠে না। সুমেরু ও কুমেরুতে বৎসরের মধ্যে একবার দিন ও একবার মাত্র রাত্রি হইয়া থাকে। সূর্য্য সুমেরুতে উদিত হইলে, ছয় মাসের মধ্যে অস্তমিত হয় না, সুতরাং এই

ছয় মাস কাল সুমেরুতে অবিচ্ছিন্ন দিবা ও কুমেরুতে অবিচ্ছিন্ন রাত্রি থাকে। ছয় মাস পরে যখন কুমেরুতে সূর্য্যের উদয় হয়, তখন কুমেরুতে ছয় মাস কাল অবিচ্ছিন্ন দিবা ও তাহার বিপরীত দিগ্বর্ত্তী সুমেরুতে উক্ত ছয় মাস কাল অবিচ্ছিন্ন রাত্রি থাকে। পৃথিবীর সুমেরু হইতে প্রায় ৮১২ ক্রোশ দক্ষিণ পর্য্যন্ত এবং কুমেরু হইতে প্রায় ৮১২ ক্রোশ উত্তর পর্য্যন্ত, যে সকল দেশ রহিয়াছে, তৎসমুদয়ে এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে প্রায় ৪,৩৮০ ঘণ্টা অর্থাৎ কিঞ্চিন্ন্যূন ছয় মাসব্যাপী দিবা ও রাত্রি হইয়া থাকে। আষাঢ় মাসের প্রথমার্দ্ধ হইতে পৌষ মাসের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত উত্তর মেরুতে এবং পৌষ মাসের প্রথমার্দ্ধ হইতে আষাঢ় মাসের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত দক্ষিণ মেরুতে সূর্য্য নিয়ত প্রকাশিত থাকে।

সুমেরু ও কুমেরুর নিকটবর্ত্তী প্রদেশে এইরূপ বহুদিনব্যাপী দিবা ও রাত্রি থাকিলেও সেস্থানের লোকদিগের কোনরূপ অসুবিধা হয় না। যে স্থানে অবিচ্ছিন্ন দিবা থাকে, সে স্থানের অধিবাসিগণ আপনাদের প্রকৃতি অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, দিবাতেই নিদ্রা যায়। যে স্থলে অবিচ্ছিন্ন রাত্রি থাকে, সে স্থানের অন্তরীক্ষে এক প্রকার নৈসর্গিক আলোক উৎপন্ন হইয়া, তমোজাল দূরীভূত করে। এই আলোকই "মেরুজ্যোতি" নামে প্রসিদ্ধ।

আমরা যেমন প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় দশ বা দ্বাদশ ঘণ্টা করিয়া সূর্য্যালোক পাই, মেরুসন্নিহিত প্রদেশের মনুষ্য প্রভৃতি সমুদয় জীবও তেমনই দীর্ঘকাল-ব্যাপী রাত্রিতে চব্বিশ ঘণ্টায় সাত আট ঘণ্টা করিয়া এই মেরুজ্যোতিঃ পাইয়া থাকে। সুতরাং তত্রত্য জীবগণের আলোকাভাবজনিত কোন কষ্ট হয় না। তাহারা মেরুজ্যোতির সাহায্যে প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া, নিয়মিত সময়ে বিশ্রামসুখ ভোগ করিয়া থাকে।

যখন মেরু-সন্নিহিত দেশে এই অপূর্ব্ব জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তখন দূরদেশস্থিত লোকেও সময়ে সময়ে উহা দেখিতে পায়। কোন কোন সময়ে এক মেরুজ্যোতিই রুশিয়ার অন্তঃপাতী মস্কো, পোলণ্ডের প্রধান নগর ওডেসা, ইতালির অন্তঃপাতী রোম এবং স্পেনের অন্তর্ব্বর্ত্তী কাদিথ নগর হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দের ২৩এ অক্টোবর উত্তর প্রদেশে যে মেরুজ্যোতিঃ আবির্ভূত হয়, তাহা লণ্ডন নগর হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল। লণ্ডনের দর্শকগণ উক্ত মেরুজ্যোতির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—"অপরাহ্ন সাত ঘটিকার সময়ে নৈঋত কোণ হইতে বায়ু কোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক জ্যোতির্ম্ময় ধনু দৃষ্টিগোচর হইল। ইহার পর বোধ হইল, যেন আলোকময় ধূম-রাশি ঐ ধনুর দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্তের অভিমুখে

ধাবিত হইতেছে। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই উহা আপনার পূর্ব্বতন সন্নিবেশ-দিক্ পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধাধোভাগে অবস্থিত হইল। ইহার পর রাত্রি নয় ঘটিকার সময়ে উক্ত ধনু উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিম দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কিয়ৎকাল মধ্যে উহা স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল এবং নগরের কোন স্থানে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইলে উপরিস্থিত আকাশ যেরূপ রক্তবর্ণ হয়, সেইরূপ লোহিতবর্ণ আলোক-শিখা সকল ঐ ধনুর দক্ষিণপশ্চিম প্রান্ত হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। নিদাঘকালে সূর্য্য অস্তমিত হইলে দিঙ্‌মণ্ডল যেমন কিয়ৎক্ষণ আলোকিত থাকে, উক্ত জ্যোতির্ম্ময় ধনু দ্বারা সমস্ত পরিদৃশ্যমান আকাশও তেমনিই আলোকিত হইয়াছিল।"

১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দের শীতকালে লাপ্‌লণ্ড দেশের অন্তর্গত বসিকপ্ নামক স্থানে যে মেরুজ্যোতিঃ দৃষ্ট হয়, দর্শকগণ তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—"বসিক-পের উত্তরদিগ্বর্ত্তী আকাশে সচরাচর যে কুজ্ঝটিকা-রাশি বিস্তৃত থাকে, তাহা অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময়ে সহসা সুবর্ণ আলোকে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। ইহার পর ঐ আলোক সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া, উজ্জ্বল পীতবর্ণ ধনুর আকার ধারণ করিল। কিয়ৎকালের মধ্যে ঐ ধনু স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল, এবং বিচ্ছিন্ন অংশ-

সমূহ হইতে অসংখ্য রশ্মি-শিখা নির্গত হইল ; এই শিখা গুলি পর্য্যায়ক্রমে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হওয়াতে, আলোকও একবার অধিক, একবার অল্প হইতে লাগিল। ক্রমে এই রশ্মিজাল বিস্তৃত ধনুর আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীর দিকে অবনত হইয়া পড়াতে, উহা এক প্রকাণ্ড গোলকার্দ্ধের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। ইহার পরে ঐ ধনু তির্য্যক্ গতিতে ঊর্দ্ধাভিমুখে উঠিতে আরম্ভ করিল। তির্য্যক্ গতিবশতঃ সর্পশরীরের সঙ্কোচন ও প্রসারণের ন্যায় উক্ত ধনুর দেহও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া, উজ্জ্বলতর রশ্মি-তরঙ্গ উৎপন্ন হইতে লাগিল। এই সময়ে উহার অধোভাগ লোহিত, মধ্য ভাগ হরিৎ এবং ঊর্দ্ধভাগ উজ্জ্বল পীতবর্ণে শোভিত হইয়া উঠিল। পরিশেষে উহার মনোহর বর্ণ সকল ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল এবং কিছুকাল পরে সমুদয় একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।"

মেরুজ্যোতির তত্ত্বনির্ণয় জন্য ফ্রান্স দেশ হইতে কতিপয় বিজ্ঞানবেত্তা উত্তর দেশে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ২০০ দিনের মধ্যে ১৫০ বার ঐ জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করেন। যে স্থান হইতে উক্ত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ মেরুজ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত মেরু দেশ হইতে অনেক দক্ষিণে অবস্থিত। প্রকৃত মেরু দেশে যে, প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়া

ঐ জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহা পণ্ডিতগণ অনুমান-বলে স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা কহেন, মেরু দেশের ষাণ্মাসিক রাত্রিকালে মেরুজ্যোতিঃ প্রতি ১৪ বা ১৫ ঘণ্টার পরে আবির্ভূত হয় বটে, কিন্তু সকল সময়ে সমান ভাবে আলোক বিস্তার করে না।

এই অত্যাশ্চর্য্য মেরুজ্যোতির প্রকৃত তত্ত্ব আজ পর্য্যন্ত সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয় নাই। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-গণ উহার প্রকৃতির সম্বন্ধে যে পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, মেরুজ্যোতিঃ কেবল তাড়িত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা যন্ত্র-বিশেষে তাড়িত-প্রবাহ চালিত করিয়া মেরুজ্যোতির অনুরূপ আলোক উৎপাদনেও সমর্থ হইয়াছেন *। এই বৈজ্ঞা-নিকগণ কহেন, সূর্য্যের কিরণে উষ্ণমণ্ডলে সমুদ্রের লবণাক্ত জলরাশি হইতে ক্রমাগত বাষ্প উৎপন্ন হই-তেছে। উৎপত্তিসময়ে ঐ বাষ্পে যৌগিক তাড়িত বর্ত্তমান থাকে। উষ্ণমণ্ডলের বায়ুর সহিত বাষ্প মিশ্রিত হওয়াতে ঐ বায়ুও যৌগিক তাড়িতবিশিষ্ট হয়। উল্লিখিত উষ্ণ বায়ু উত্তর ও দক্ষিণ দিকে

* বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা কোন একটি কাচের নলের মধ্যভাগ হইতে সমুদয় বায়ু বাহির করিয়া ফেলিয়া, উহার উভয় প্রান্তস্থিত দুই খণ্ড ধাতুর এক খণ্ডে যৌগিক ও অপর খণ্ডে বিয়োগিক তাড়িত প্রবেশিত করিলে, উক্ত দুই প্রকার তাড়িত কাচের নলের মধ্যে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া, মেরু-জ্যোতির অনুরূপ আলোক উৎপাদন করে।

প্রবাহিত হইয়া সুমেরু ও কুমেরুর শীতল বায়ু রাশির সহিত মিলিত হয়। এই শীতল বায়ুতে বিয়োগিক তাড়িত বর্ত্তমান থাকে। এই বিপরীত তাড়িতদ্বয়ের সম্মিলনে মেরুজ্যোতির উৎপত্তি হয়।

শাস্ত্রালোচনা।

শাস্ত্রালোচনা এক প্রকার আমোদ। যখন নানা প্রকার দুশ্চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়,, মন বিরক্ত হইয়া উঠে, তখন নির্জ্জনে শাস্ত্র অনুশীলন করিলে সুখে সময় অতিবাহিত হয়। বাগ্মিতা শাস্ত্রচর্চ্চার দ্বিতীয় ফল। বিবিধ সদ্‌গ্রন্থ আয়ত্ত থাকিলে, যুক্তি-পূর্ণ বাক্‌-চাতুরী দ্বারা সাধারণের মন আকৃষ্ট ও অভিমত বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। শাস্ত্রালোচনায় বিচার-শক্তিরও বিকাশ হইয়া থাকে। বুদ্ধি থাকিলে বহুদর্শন দ্বারা প্রাবীণ্য লাভ হয় বটে; কিন্তু সৎপরামর্শ দিয়া কোন দুরূহ কার্য্য সাধন করিতে হইলে, নানা শাস্ত্রে বুদ্ধিবৃত্তি সংস্কৃত ও মার্জ্জিত করা আবশ্যক।

শাস্ত্রালোচনার এই প্রকার মহৎ ফল থাকিলেও কেবল উহাতেই আসক্ত থাকিয়া, আয়ুক্ষয় করা নিরবচ্ছিন্ন আলস্য প্রকাশ মাত্র। আলাপের সময়ে অলঙ্কার-প্রয়োগ ও শব্দঘটা প্রকাশ করা কেবল

বিদ্যাভিমানীর কাজ, এবং বিচারের সময়ে সকল বিষয়েই শাস্ত্রীয় নিয়মের অনুসরণ করা পণ্ডিত-মূর্খের কর্ম্ম। সহজ জ্ঞান শাস্ত্র-জ্ঞানে মাজ্জিত হয়, এবং শাস্ত্র-জ্ঞান লৌকিক জ্ঞানে সংস্কৃত ও ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। পুস্তক পড়িলেই কিছু বিজ্ঞতা জন্মে না, পরিদৃশ্যমান জগতের ব্যবস্থা দেখিয়া, বিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিতে হয়। এই বিজ্ঞতাই শাস্ত্রজ্ঞানে মাজ্জিত হইলে, ফলোপ-ধায়িনী হইয়া থাকে। ধূর্ত্তেরা শাস্ত্রকে দ্বেষ করে, সরল-হৃদয় ব্যক্তিগণ ভক্তি করে, এবং বিজ্ঞেরা কাজে লাগাইয়া সার্থক করেন। বিচার-ক্ষমতা দেখাইয়া বাদীবিজয় বা বিদ্যা প্রকাশ করা, অধ্যয়নের উদ্দেশ্য নহে; বুদ্ধিবৃত্তি মাজ্জিত করাই অধ্যয়নের মুখ্য প্রয়োজন। সকল প্রকার পুস্তক সমানভাবে অধ্যয়ন করা আবশ্যক হয় না। কতকগুলি অংশতঃ মাত্র পড়িতে হয়, কতকগুলিতে নয়নাবর্ত্তন করিলেই হয়, কতকগুলি গাঢ় অভিনিবেশ-সহকারে আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিতে হয়, এবং সংগ্রহমাত্র পাঠ করিয়া বা পরের মুখে শুনিয়া, কতকগুলির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ সকল মূল দেখিয়াই পড়া উচিত; সে সকলের সংগ্রহ-পাঠে তাদৃশ উপকার হয় না। পরিস্রুত জল ও পরিস্রুত পুস্তক, উভয়ই তুল্য, উভয়ই সমান বিস্বাদ ও সমান অতৃপ্তিকর।

শাস্ত্রালোচনায় বহুদর্শী হওয়া যায়, অপরের সহিত শাস্ত্রালাপ করিলে বাগ্মিতা জন্মে, এবং রচনা লিখিলে শাস্ত্রজ্ঞান পাকা হইয়া উঠে। রচনার আর একটি গুণ এই যে, কোন সদ্‌গ্রন্থ পড়িয়া, সেই গ্রন্থোক্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিলে স্মৃতিশক্তি বৰ্দ্ধিত হয়। যদি রচনা লিখিবার অভ্যাস না থাকে, তাহা হইলে অসাধারণ মেধা থাকা চাই, যদি অন্যের সহিত শাস্ত্রালাপ না হয়, তাহা হইলে বিলক্ষণ প্রতিভা থাকা আবশ্যক, আর যদি অধ্যয়নে ন্যূনতা থাকে, তাহা হইলে সেই ন্যূনতা গোপন করিবার জন্য অনেক উপায় করিতে হয়, নচেৎ বিজ্ঞসমাজে সম্ভ্রম রক্ষা পায় না।

ইতিহাসপাঠে বিজ্ঞতা, সাহিত্যপাঠে শব্দ-প্রয়োগ-নৈপুণ্য, পদার্থবিদ্যাপাঠে গাম্ভীর্য্য, ধর্ম্ম-নীতি পাঠে ধীরতা এবং তর্কশাস্ত্রপাঠে বিচার-পটুতা জন্মে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শ্রম করিলে, ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের দৌর্ব্বল্য নষ্ট হয়, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শাস্ত্র অনুশীলন করিলে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক ন্যূনতা অন্তর্হিত হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত নিরতিশয় চঞ্চল, কোন বিষয়েই অধিকক্ষণ অভিনিবিষ্ট থাকে না, তাহার গণিত শাস্ত্র শিক্ষা করা উচিত, যেহেতু এই শাস্ত্রের কোন প্রতিজ্ঞা সমাধান করিবার সময়ে মন একটুকু অন্য বিষয়ে আসক্ত হইলেই পুনর্ব্বার সেই প্রতিজ্ঞার মূল

হইতে ধরিতে হয়; এইরূপে বারংবার ঠেকিলেই একাগ্রতা অভ্যস্ত হইয়া আইসে। যাহার বুদ্ধি স্থূল, সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রবিষ্ট হয় না, তাহার ন্যায়-শাস্ত্র অনুশীলন করা কর্ত্তব্য; এই শাস্ত্রের আলোচনা করিলে, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে। ব্যবহার শাস্ত্রেরও বিলক্ষণ উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। এই শাস্ত্র পাঠ করিলে দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া, অভিমত বিষয় উপপন্ন করিবার ক্ষমতা জন্মে। এইরূপে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের অনুশীলনে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

সংযুক্তা *।

সংযুক্তা কান্যকুব্জ-পতি জয়চন্দ্রের দুহিতা। ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। সুপ্রসিদ্ধ চাঁদ কবি চৌহানরাসোর কানোজখণ্ডে ইঁহার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। সংযুক্তা তাৎকালিক মহিলাদিগের আদর্শস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার কেবল অনুপম সৌন্দর্য্য ছিল না, অসাধারণ উদারতাও ছিল। সংযুক্তার গুণ-গরিমা এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, চাঁদ তাঁহাকে কান্যকুব্জের লক্ষ্মী বলিয়া বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

* কেহ কেহ ইহাঁকে "সংযোগিতা" নামে নির্দ্দেশ করেন। অধিকন্তু "রাজাবলিতে" ইহাঁর নাম "অনঙ্গমঞ্জরী" লিখিত আছে।

জয়চন্দ্র রাঠোর-বংশীয় রাজপুতদিগের এবং প্রসিদ্ধ দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজ চৌহান-বংশীয় রাজপুতদিগের প্রধান ছিলেন। এই রাঠোর ও চৌহানকুলের মধ্যে মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ ছিল; পৃথ্বীরাজ অতুল সৌভাগ্য-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, একদা প্রসিদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখিয়া, তদীয় পরম শত্রু জয়চন্দ্রের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়। জয়চন্দ্র স্বীয় গৌরব ও প্রাধান্য অপ্রতিহত করিবার জন্য অচিরাৎ রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। এই শেষবার ক্ষত্রিয়ের রাজধানীতে ক্ষত্রিয় রাজগণের অভীষ্ট মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হয়। ভারতীয় রাজন্যশ্রেষ্ঠের মধ্যে সকলেই এই মহাযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া, কান্যকুব্জে আগমন করেন, কেবল দিল্লীর পৃথ্বীরাজ ও মিবারের অধিপতি সমরসিংহের আগমন হয় না। ইহাঁরা আপনাদের বর্ত্তমানে জয়চন্দ্রকে উক্ত মহাযজ্ঞ সম্পাদনের অযোগ্য বলিয়া নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেন। জয়চন্দ্র এজন্য অভিমানী হইয়া পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহের দুইটি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া উহাদিগকে যথাক্রমে দ্বারবান্ ও স্থালীপরিষ্কারকের পদে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। এদিকে আড়ম্বরের সহিত রাজসূয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। যজ্ঞান্তে কান্যকুব্জ-লক্ষ্মী সংযুক্তার স্বয়ম্বরের উদ্‌যোগ হইতে থাকে। স্বয়ম্বর-

প্রথা পূর্ব্বে রমণীকুলের মনোমত বর-নির্ব্বাচনের উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া পরিগণিত ছিল। বর্ণনীয় সময়ে এই রীতি আর্য্যসমাজ হইতে একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। উক্ত পদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইয়া গুণ-গৌরব-শ্রেষ্ঠ বাহুবলদৃপ্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ একে একে কান্যকুব্জের স্বয়ম্বর-সভা অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। রাজগণের অধিবেশনের পরে সংযুক্তা স্বয়ম্বরোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, হস্তে বর-মালা ধারণ পূর্ব্বক ধাত্রীর সহিত সভা-গৃহে সমাগতা হইলেন।

যখন হৃদয়ে প্রগাঢ় অনুরাগের সঞ্চার হয়, তখন ঐ অনুরাগ কোনরূপ প্রতিকূলতায় নিবারিত হয় না। সংযুক্তা ইহার পূর্ব্বেই পৃথ্বীরাজের অলোকসামান্য গুণ, অলোকসামান্য সাহস ও অলোকসামান্য বীরত্বের বিবরণ শুনিয়া তৎপ্রতি আসক্তা হইয়াছিলেন। এক্ষণে পিতৃর শক্রতায় সে আসক্তি নিরাকৃত হইল না। তিনি সাহসের সহিত পৃথ্বীরাজকেই বরমাল্য দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সুশোভন সভামণ্ডপস্থ সুসজ্জিত রাজগণের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল না। সংযুক্তা সকলকে অতিক্রম করিয়া, পৃথ্বীরাজের প্রতিকৃতির গলদেশে বর-মাল্য সমর্পণ করিলেন। জয়চন্দ্র দুহিতার এই কার্য্যে ম্রিয়মাণ হইলেন, স্বয়ম্বর-স্থলীর রাজগণ তাদৃশ

রূপ-গুণ-সম্পন্ন ললনা-রত্ন লাভে হতাশ হইয়া আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার মাল্যার্পণ-সংবাদ শুনিতে পাইলেন। সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি সৈন্য লইয়া, কান্যকুব্জে আসিয়া, সংযুক্তাকে পিতৃভবন হইতে হরণ করিলেন। জয়চন্দ্র কন্যারত্নের উদ্ধারার্থ যথাশক্তি চেষ্টা পাইলেন, কান্যকুব্জ হইতে দিল্লীর পথে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। কিন্তু পরিশেষে পৃথ্বীরাজের জয়লাভ হইল। জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষুব্ধহৃদয়ে কান্যকুব্জে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল*।

কেহ কেহ পৃথ্বীরাজকৃত সংযুক্তা-হরণ-ঘটনা ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল বলিয়া, উল্লেখ করিয়াছেন। আবার কাহারও মতে উহা উক্ত সময়ের পনর বৎসর পরে ঘটিয়াছিল†। যাহা হউক, পৃথ্বীরাজ এই অসামান্য

* কেহ কেহ কহেন, জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তিকে দ্বার-রক্ষকের পদে স্থাপিত করাতে পৃথ্বীরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া, সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে কান্যকুব্জে আগমন পূর্ব্বক জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। এই সময়ে সংযুক্তা পৃথ্বীরাজকে দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। ইহার পরে সংযুক্তা পিতৃকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া উত্তর করেন যে, তিনি পৃথ্বীরাজকেই বিবাহ করিবেন। পৃথ্বীরাজ লোকপরম্পরায় এই সংবাদ শুনিয়া পুনর্ব্বার সসৈন্যে কান্যকুব্জে আসিয়া, সংযুক্তাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন।

† আমাদের বিবেচনায় এই শেষোক্ত (১১৯০ খ্রীঃ অব্দ) সময়ই ঠিক। ১১৭০ খ্রীঃ অব্দে যখন সংযুক্তার জন্ম, তখন ১১৭৫ অব্দে কি প্রকারে তিনি স্বয়ম্বরা হইবেন? পঞ্চবর্ষীয়া বালিকা কখনও স্বয়ং পতি মনোনীত করিতে পারে না।

ললনা-রত্নের অধিকারী হইয়া, অনুক্ষণ তদ্গতাচত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, সংযুক্তার অসাধারণ গুণে স্বর্গ-সুখও তাঁহার নিকটে তুচ্ছ বোধ হইল। সংযুক্তা অল্প সময়ের মধ্যেই ভর্ত্তার প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন।

পৃথ্বীরাজ যখন এইরূপ সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন, সংযুক্তা যখন এইরূপ পতি-সোহাগিনী হইয়া আহ্লাদসাগরে ভাসিতেছিলেন, তখন শাহাবদ্দিন (মহম্মদ গোরী) ভারতভূমি আক্রমণ করিলেন। সংযুক্তা আসন্ন শত্রুর ভীষণ আক্রমণ হইতে জন্মভূমি রক্ষা করিতে যত্নপর হইলেন। কিরূপে যবন-সৈন্য বিধ্বস্ত হইবে, কিরূপে যবন-গ্রাস হইতে ভারত-ভূমি রক্ষা পাইবে, এই চিন্তাই এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি ভর্ত্তাকে সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া, শীঘ্র রণক্ষেত্রে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সংযুক্তার যত্ন কেবল এই অনুরোধমাত্রেই শেষ হইল না। তিনি সমস্ত যুদ্ধোপকরণ একত্র করিয়া, গম্ভীর স্বরে পৃথ্বীরাজকে কহিলেন, "জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। আমরা অদ্য যে জীবনস্রোতে দেহ ভাসাইয়া পার্থিব সুখ উপভোগ করিতেছি, হয় ত কল্যই তাহা অনন্ত সাগরে বিলীন হইতে পারে। এইরূপ ক্ষণভঙ্গুর দেহের মমতায় আকৃষ্ট হইয়া, যশের চিরন্তন সুখে জলাঞ্জলি দেওয়া বিধেয়

নহে। যিনি মহৎ কার্য্য সাধন করিতে গিয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তিনি চিরকাল এই জগতে বর্ত্তমান থাকেন। আমি আশা করি, তুমি নিজের বিষয় না ভাবিয়া, অমরতার দিকে মনোযোগী হইবে। তোমার করস্থিত শাণিত অসি শক্রর দেহ দ্বিখণ্ড করুক, তোমার অধিষ্ঠিত তেজস্বী অশ্ব শক্রর শোণিতস্রোতে সন্তরণ করুক, তোমার সৈন্যদল "হর হর" ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করুক। এই মহৎ কার্য্যে মৃত্যুকে ভয় করিও না, রণস্থলে ভীত বা কর্ত্তব্য-বিমুখ হইও না। সাহস, উদ্যম ও যত্নের সহিত স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর, আমি পরলোকে তোমার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইব।" বীরবালা, বীরজায়ার মুখ হইতে এইরূপ তেজস্বিতা-সূচক বাক্য নির্গত হইয়াছিল, এইরূপ বাক্যে পৃথ্বীরাজ সঙ্কল্প সাধনে দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

অবিলম্বে সৈন্যগণ সমবেত হইয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। ভারতের প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয় বীর এই মহাযুদ্ধে শরীর ও মন উৎসর্গ করিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের রাজন্য-কুলের 'হর হর' ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক কম্পিত হইতে লাগিল। হিন্দুরাজ-চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরাজ এই সেনার অধিনায়ক হইয়া শাহাবদ্দিনকে সমরে আহ্বান করিলেন। উত্তর ভারতের নারায়ণপুর গ্রামে (তিরৌরী-ক্ষেত্র) উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। যবন-সৈন্য

ক্ষত্রিয় বীরগণের পরাক্রমে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল, শত্রুর পতাকা, শত্রুর অস্ত্র, পৃথ্বীরাজের হস্তগত হইল। শাহাবদ্দিন গোরী পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিল। পৃথ্বীরাজ বিজয়ী হইয়া মহা উল্লাসে দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পরাজিত হইবার দুই বৎসর পরে শাহাবদ্দিন আবার ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন। পৃথ্বীরাজ এবারেও যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সমর-সংক্রান্ত সভা সংগঠিত হইল, নানা স্থান হইতে সৈন্য-গণ সমবেত হইতে লাগিল, ক্ষত্রিয় রাজগণ একে একে আসিয়া অধিনায়কের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিনের মধ্যেই দিল্লীতে পুনর্ব্বার বহুসংখ্য সৈন্যের আবির্ভাব হইল।

যুদ্ধ-যাত্রীর সকলেই স্ব স্ব পরিবারবর্গের নিকটে বিদায় লইল। মাতা, দুহিতা, স্ত্রী, সকলেই তাহাদিগকে 'রণে ভঙ্গ দেওয়া অপেক্ষা রণ-ভূমিতে দেহ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ' বলিয়া বিদায় দিল। এদিকে সংযুক্তা ভর্ত্তাকে বীরবেশে সজ্জিত করিলেন, সাজাইতে সাজাইতে তাঁহার হৃদয় হঠাৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল, হঠাৎ দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল। সংযুক্তা অনি-মেষ-লোচনে পৃথ্বীরাজের দিকে চাহিলেন, অতর্কিত-ভাবে কয়েকটি মুক্তাফল কপোল বহিয়া বক্ষে পতিত

হইল। পৃথ্বীরাজ কালবিলম্ব না করিয়া সৈন্যদল সমভিব্যাহারে নগর হইতে বহির্গত হইলেন। সংযুক্তা ভর্ত্তার গমনপথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সহিত কহিলেন, "স্বর্গ ব্যতিরিক্ত বোধ হয়, আর এই যোগিনীপুরে (দিল্লীতে) দয়িতের সহিত সম্মিলন হইবে না।

সৌভাগ্য-লক্ষ্মী চিরদিন এক জনের পক্ষে থাকেন না—চিরদিন কাহারও সমান যায় না। অদৃষ্ট চক্র-নেমির ন্যায় একবার ঊর্দ্ধ, আবার অধোগামী হইয়া, ইহলোকে আপনার চাঞ্চল্য দেখাইতেছে। পৃথ্বীরাজ তিরৌরীক্ষেত্রে যে বিজয়পতাকায় শোভিত হইয়াছিলেন, মুসলমানদিগের চাতুরীতে দ্বিতীয় যুদ্ধে তাহা বিচ্যুত হইয়া পড়ে। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কাগার নদীর তীরে মহম্মদ গোরীর সহিত এই দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। যত ক্ষণ পবিত্র ক্ষত্রিয়-শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে বর্ত্তমান ছিল, ততক্ষণ হিন্দু-সৈন্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিল। কিন্তু পরিশেষে তাহাদের দেহ-রত্ন ভারতভূমির ক্রোড়-শায়ী হইতে লাগিল। পৃথ্বীরাজ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া শত্রু-হস্তে নিহত হইলেন। ক্ষত্রিয়-শোণিতে ভারতের দেহ কলঙ্কিত হইল, ক্ষত্রিয়ের শোণিত-সাগরে ভারতের সৌভাগ্য-রবি ডুবিতে লাগিল, সংযুক্তার অমঙ্গল আশঙ্কা ফলে পরিণত হইয়া গেল।

এই সাংঘাতিক সংবাদ দিল্লীতে পঁহুছিল। সংবাদ পাওয়ামাত্র সংযুক্তা চিতা সজ্জিত করিলেন, অবিলম্বে চিতানল জ্বলিয়া উঠিল। সংযুক্তা রত্নময় অলঙ্কার-রাশি দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক রক্তবস্ত্র-পরিহিত ও রক্ত-মাল্যে বিভূষিত হইয়া এই অনলে প্রবেশ করিলেন। নিমেষ মধ্যে তাঁহার অনুপম লাবণ্য-ময় কমনীয় দেহ ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। সংযুক্তার জীবনের এই শেষভাগ কি ভয়ঙ্কর! কি লোমহর্ষণ!

পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে ছাড়িয়া যত দিন রণভূমিতে ছিলেন, তত দিন কেবল জল সংযুক্তার জীবন-রক্ষার অবলম্বন ছিল। চাঁদ কবির গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সংযুক্তার এই অসাধারণ পাতিব্রত্যের বিবরণ বর্ণিত আছে। সংযুক্তা পতিব্রতার দৃষ্টান্ত-স্থল, স্বর্গস্থ দেবীসমাজের বরণীয়া। পতিব্রতার শিরঃস্থানীয় সাবিত্রীর শ্রেণীতে তাঁহার নাম নিবেশিত হওয়ার যোগ্য।

এক্ষণে প্রাচীন দিল্লীতে প্রবেশ করিলে সংযুক্তা-ঘটিত অনেক চিহ্ন দৃষ্ট হয়। যে দুর্গে সংযুক্তা থাকিতেন, তাহার প্রাচীর অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, যে প্রাসাদে সংযুক্তা পতিসোহাগিনী হইয়া অবস্থিতি করিতেন, তাহার স্তম্ভ অদ্যাপি প্রাচীন দিল্লীর ভগ্নাবশেষ শোভিত করিতেছে। কালের কঠোর আক্র-

মণে এক সময়ে এই ভগ্নাবশেষ মৃত্তিকাসাৎ হইবে, এক সময়ে এই ভগ্নাবশেষের ইষ্টকরাশি অন্য প্রাসাদের দেহ পরিপুষ্ট করিবে, কিন্তু উহার অধিষ্ঠাত্রী সংযুক্তা কখনও এই জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইবেন না। তাঁহার পতি-প্রেম, তাঁহার পাতিব্রত্য, তাঁহার মহাপ্রাণতা, চিরকাল তাঁহাকে পবিত্র ইতিহাসে জাজ্জ্বল্যমান রাখিবে।

ভূমিকম্প ও তাহার উপকারিতা।

পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, পৃথিবী এক সময়ে প্রজ্বলিত পিণ্ডস্বরূপ ছিল। কালক্রমে উহার পৃষ্ঠদেশ শীতল হইয়া জীবসমূহের আবাস-যোগ্য হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্তর্ভাগ আজ পর্য্যন্ত শীতল হয় নাই। প্রচণ্ড অগ্নির উত্তাপে পূর্ব্বের ন্যায় প্রজ্বলিত অবস্থায় আছে। ঐ প্রজ্বলিত পদার্থে, বা উহার নিকটবর্ত্তী উত্তপ্ত প্রস্তর ও মৃত্তিকায় কোন প্রকারে জল লাগিলে বাষ্প জন্মে। এই বাষ্পের প্রসারণ-শক্তিতে ভূমিকম্প ও তদানুষঙ্গিক উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। রসায়ন-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, চূর্ণবীজ, ক্ষার-বীজ, মৃদ্-বীজ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু ভূগর্ভে নিহত আছে। ঐ সকলে জল লাগিলে অগ্নির উৎপত্তি হয়। ঐ অগ্নি সমীপবর্ত্তী যে

সকল পদার্থ দ্রবীভূত করে, তৎসমুদয় পরস্পর আলো-ড়িত হইলে ভূমি-কম্প ও আগ্নেয় গিরির উৎপত্তি হয়। লৌহ-চূর্ণ ও গন্ধক কিঞ্চিৎ জলের সহিত মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিলে, কিয়ৎক্ষণ মধ্যে তাহা স্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী ভূমি কম্পিত করে। এ জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, গন্ধক-মিশ্রিত লৌহের খনিতে জল পতিত হইলে ভূমি-কম্প হইয়া থাকে।

ভূমি-কম্প বড় ভয়ানক ঘটনা। আমাদের দেশে উহার তাদৃশ ভয়ঙ্করভাব দৃষ্ট হয় না। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় এই উপদ্রবে অনেকের অনিষ্ট হইয়া থাকে। তথায় ভূকম্প সময়ে ভূগর্ভ হইতে ভীষণ ধ্বনি উৎপন্ন হয়, গৃহছাদ ভগ্ন হইয়া পড়ে, প্রাচীর সকল বিদীর্ণ হইয়া যায়, পশুসকল লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া কম্পিতকলেবরে ইতস্ততঃ ধাবমান হয়, বিহঙ্গম-কুল কলরব করিতে করিতে আকাশে উড্ডীয়মান হইতে থাকে, মনুষ্যগণ আবাস-গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া প্রশস্ত ক্ষেত্রে শয়ন করে, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস প্রলয়ের ধ্বজা স্বরূপ আসিয়া সমস্ত ভূভাগ ভাসাইয়া দেয়। কোন কোন সময়ে সমু-দ্রের তরঙ্গ ৩০।৪০ হস্ত উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, ক্ষেত্র-শায়িত জনগণের উপর পতিত হইয়া থাকে। এইরূপ উপদ্রবে মধ্য-আমেরিকার গোয়াতেমালা নগর উৎসন্ন

হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকার কারাকাস, নামক একটি নগরে বার হাজার মনুষ্য বিনষ্ট হয়। কুইতো ও রিওবাম্বা নগর চল্লিশ হাজার মনুষ্যের সহিত এই কারণে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত লাইমা প্রভৃতি অনেক-গুলি নগর ভূকম্প দ্বারা অনেক বার উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে।

ভূকম্পে কেবল গৃহাদি বিনষ্ট হয় না, ভূভাগও অনেক অংশে রূপান্তরিত হইয়া যায়। পৃথিবী স্থানে স্থানে স্ফুটিত হয়। এই স্ফুটিত স্থান হইতে জল, কর্দ্দম, বাষ্প, ধূম, ধাতুনিঃস্রবাদি অতি দূরে উৎক্ষিপ্ত হয়। প্রাচীন জলোৎস সকল বিলুপ্ত হয়, নূতন স্থান হইতে উৎস নির্গত হইতে থাকে। কোন স্থান বসিয়া যায় এবং কোন স্থান উন্নত হইয়া উঠে। কথিত আছে, কালাব্রিয়া দেশে যে ভূকম্প হয়, তাহাতে কতিপয় ক্ষুদ্র পর্ব্বত স্থানান্তরিত হইয়াছিল। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে চিল্লি দেশের ভূকম্পে সমুদ্র-তটের অবস্থা পুনঃ পুনঃ পরি-বর্ত্তিত হইয়াছে। ১৮২২ অব্দে উক্ত দেশের বাল-পারীসো নগরের ২৫ ক্রোশ-পরিমিত ভূমি দুই হস্ত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ইহার তিন বৎসর পরে সেণ্ডমারিয়া দ্বীপ জল-সীমা হইতে ৬ হস্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং উহার চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী জলের গভীরতার হ্রাস হইয়া যায়।

পূর্ব্বে সিন্ধু নদীর শাখায় এক ফুট পরিমিত জল থাকিত। কয়েক বৎসর হইল, কচ্ছ দেশে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, তাহাতে ঐ নদীর গর্ভ কুড়ি ফীট নিম্ন হয়, সুতরাং সেই অবধি তথাকার জল একুশ ফীট গভীর হইয়াছে। এই ভূকম্পে ভূজনগর ও তাহার চারিদিকের ভূমি নিম্ন হইয়া 'রন্ন' নামক হ্রদে পরিণত হয়। সিন্ধুরী নামক দুর্গ ও গ্রাম বসিয়া যায়, এবং তাহাতে জল প্রবেশ করে। সিন্ধুরী দুর্গের উপরিভাগ জল-মগ্ন না হওয়াতে অনেকে উহাতে উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করে। সিন্ধুরী হইতে অন্যূন ৫ মাইল দূরে ৫০ মাইল দীর্ঘ, ১৬ মাইল প্রশস্ত ও পার্শ্বভূমি হইতে ১০ ফীট উচ্চ একটি পাহাড় উৎপন্ন হয়। ঈশ্বর-কৃত ভাবিয়া লোকে ঐ পাহাড়কে "আল্লাবন্দ" অর্থাৎ ঈশ্বরের বাঁধ নামে নির্দ্দেশ করে। ঐ পাহাড়ের এক স্থান ভেদ করিয়া সিন্ধু নদী প্রবাহিত হইতেছে। অদ্যাপি সিন্ধুরী দুর্গের অগ্রভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৭৬২ অব্দে চট্টগ্রামে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হওয়াতে অনেক স্থান ফাটিয়া যায়। স্ফুটিত স্থান হইতে গন্ধক-মিশ্রিত জল ও কর্দ্দম নিঃসৃত হয়। একটি নদী শুষ্ক হইয়া যায়, এবং ৭০ বর্গ মাইল পরিমিত ভূমি দুই শত লোকের সহিত সাগর-গর্ভে নিমগ্ন হয়। এই কম্পনে মগ দেশের একটি পাহাড় একবারে অন্তর্হিত হয় এবং

কতিপয় গ্রাম জলপ্লাবিত হইয়া যায়। এইরূপে চট্ট-গ্রামের উপকুল-ভাগ যখন বসিয়া যায়, তখন অদূরবর্ত্তী রামড়ী ও চেদুপ দ্বীপ উন্নত হইয়া উঠে।

এক সময়ে লিস্‌বন নগরে বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ভয়ানক শব্দ উত্থিত হয়, উহার অব্যবহিত পরে এমন ভয়ানক ভূকম্প হয় যে, ছয় মিনিটের মধ্যে ষাটি হাজার লোকের সহিত উক্ত নগর উৎসন্ন হইয়া যায়। এই ভূকম্পের গতি প্রতি মিনিটে বিংশতি ক্রোশ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। সমস্ত ইউরোপখণ্ডে ও আফ্রিকার কিয়-দংশে এই কম্পন ব্যাপ্ত হয়। এই সময়ে সমুদ্র স্ফীত হইয়া নিয়মিত সীমা হইতে ২০। ৩০ বা ৪০ হস্ত উন্নত হইয়াছিল। কালাব্রিয়া নগরে যে ভূকম্প হয়, তাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তাহাতে ক্ষণকাল মধ্যে দুই শত নগর ও গ্রাম এবং লক্ষাধিক মনুষ্য বিনষ্ট হইয়াছিল। এই উপদ্রবে অনেক ক্ষেত্র ও প্রশস্ত ভূমি-খণ্ড সকল স্থানান্তরিত হয়। ইহাতে একের ভূমি অন্যের অধিকারে যাইয়া পড়াতে, অনেক বিবাদ ও রাজ-দ্বারে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা ভূমির কম্পন তিন প্রকার স্থির করিয়াছেন। প্রথম, উৎক্ষিপ্তকম্পন। এই কম্পনে বোধ হয় যে, ভূমি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। রিও-বাম্বা নগর এই উৎক্ষিপ্তকম্পনে বিনষ্ট হয়। ইহাতে

পর্ব্বত-পাদ-দেশ-স্থিত গ্রামের মনুষ্য পশ্বাদি পর্ব্বতের উপর উত্থিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়, ঊর্ম্মিবৎ কম্পন। এই কম্পনে ভূমি জলতরঙ্গের ন্যায় কম্পিত হয়। সাধারণ ভূকম্প এই প্রকারই হইয়া থাকে। তৃতীয়, ঘূর্ণিত বা অৰ্দ্ধ-ঘূর্ণিত কম্পন। এই কম্পন অত্যন্ত ভয়ানক। এতদ্দ্বারা ক্ষেত্রাদি স্থানান্তরিত হইয়া যায়। লিস্‌বন ও কালাব্রিয়ার ভূমিকম্প এই শেষোক্ত প্রকারের হইয়াছিল।

ভূমিকম্প অল্পক্ষণস্থায়ী। বিশেষতঃ ভূমিকম্প যত প্রবল হয়, উহার স্থিতি ততই অল্প হইয়া থাকে। প্রবল ভূকম্পন এক বিপলের মধ্যেই নিরস্ত হয়। কারাকাস্ নগরে যে ভীষণ ভূমিকম্প হয়, তাহা দুই পল মাত্র ছিল। এই দুই পলের মধ্যে তিন বার কম্পন হয়। কোন কোন স্থলে ভূমি অল্প অল্প কাঁপিয়া পরিশেষে প্রবলবেগে কম্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভীষণ ভূমিকম্প একবারেই হইয়া থাকে, উহার পূর্ব্বে আর কোনরূপ স্বল্প কম্পন হয় না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ভূমিকম্পের সময়ে ভূগর্ভ হইতে মেঘগর্জ্জনবৎ অথবা দূরাগত কামান-ধ্বনির ন্যায় গভীর শব্দ হইয়া থাকে। কিন্তু সকল ভূমিকম্পেই ঐরূপ শব্দ শ্রুত হয় না। যে কম্পনে রিওবাম্বা নগর উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহার সময়ে কোন রূপ শব্দ কর্ণ-

গোচর হয় নাই। কোন কোন সময়ে পৃথ্বীগর্ভ হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হয়, অথচ সে সময়ে কোন ভূকম্প অনুভূত হয় না। ভূমিকম্পের অনেক পূর্ব্বসূচনা হইয়া থাকে। বায়ু সহসা প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, অথবা নিস্তব্ধভাব ধারণ করে, অতি বৃষ্টি হইতে থাকে, দিঙ্মণ্ডল কুজ্ঝটিকাবৃত ও সূর্য্য রক্তাভ হয়, ভূমি হইতে বাষ্পবিশেষ নির্গত হয়, এবং মনুষ্যের বমনেচ্ছা জন্মিয়া থাকে।

ভূমিকম্পের সংহারিণী শক্তি থাকিলেও উহাদ্বারা পৃথ্বীমণ্ডলের অনেক উপকার হয়। জল, ভূমির পরম শত্রু। জলের সংহারিকা শক্তিতে ভূমি নিয়তই ক্ষয়িত হইতেছে। দ্বিবিধ প্রকারে জলের এই সংহারিকা শক্তির কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয়। এক, সমুদ্রের জল ক্রমাগত উপকূলভাগ আঘাত করিয়া, উহা ক্রমশঃ ক্ষয় করিতে থাকে। জলের এই সংহারক কার্য্যের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সমুদ্রের উপদ্রবে এক্ষণে সুন্দর বন ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের দেশের পদ্মানদী দ্বারা যে, অনেক জনপদ উৎসন্ন হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সেটলাণ্ড দ্বীপ-শ্রেণী কঠিন প্রস্তরময় পদার্থে নির্ম্মিত। সমুদ্রের অভাবনীয় শক্তিতে ঐ দ্বীপের বৃহদাকার প্রস্তরখণ্ডও দূরে অপসারিত ও গিরিশৃঙ্গে

গভীর গহ্বর উৎপন্ন হইয়াছে। এই উপদ্রবে ইঙ্গ্লণ্ডের পশ্চিম উপকূলস্থিত অনেক প্রাচীন ও সমৃদ্ধ স্থানও সাগরগর্ভে বিলীন হইতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই সংহার-কার্য্য নিয়ত ঘটিতেছে। জলদ্বারা পৃথিবীর প্রভূত অংশ বিনষ্ট হয়। উহার অত্যল্প ভাগমাত্র একত্র হইয়া, চররূপে পরিণত হইয়া থাকে। জলপ্রবাহে পৃথিবী যতই ক্ষয়িত হয়, ততই ঐ রূপ চরের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সকল চরের পরিমাণ-বৃদ্ধিও জলের সংহারকতার একটি প্রধান প্রমাণ। কিন্তু ভূমির নিয়ত যে ক্ষতি হইতেছে, ঐ সকল চর দ্বারা সেই ক্ষতির পূরণ হয় না। একস্থানের মৃত্তিকাই স্থানান্তরে অপসারিত হইয়া চরের উৎপত্তি করে, সুতরাং চর ভূভাগবৃদ্ধির কারণ নহে; উহা কেবল ভূমির স্থানান্তরে অপসরণ মাত্র; অধিকন্তু যে সময়ের মধ্যে জল-ধৌত মৃত্তিকারাশি জমিয়া চর উৎপন্ন হয়, সেই সময়ের মধ্যেই আবার জল-প্রবাহে পৃথিবীর অধিকাংশ ক্ষয়িত হইয়া যায়, সুতরাং স্থানে স্থানে চরের উৎপত্তি হইলেও, তরঙ্গাঘাতে পৃথিবীর বহুল পরিমাণে ক্ষতি হইয়া থাকে।

জলের সংহারিকা শক্তির দ্বিতীয় রূপ, বৃষ্টি। সমুদ্র অথবা নদীর তরঙ্গ-মালার অভিঘাত প্রতিঘাতে যে ক্ষতি হয়, তাহা কেবল তটভাগেই হইয়া থাকে। তট-

দেশ ভিন্ন অন্য কোথাও সমুদ্রের উপদ্রব দৃষ্ট হয় না। যে স্থানে সমুদ্রের অথবা নদীর তরঙ্গের গতি নাই, সেস্থানে বৃষ্টির জলে ভূমি ক্ষয়িত হইয়া যায়। সমুদ্র হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া, পৃথিবীর নানা স্থানে বৃষ্টিরূপে পতিত হইতেছে, বৃষ্টির প্রভাবে সেই সেই স্থানের ভূমিও নিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। ভূমি-ক্ষয়ের যতগুলি কারণ আছে, তাহার মধ্যে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বৃষ্টির জলকেই সর্ব্ব-প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৃষ্টির জল নদী, উপনদী প্রভৃতি পথ দিয়া সমুদ্রে পতিত হয়। সমুদ্র হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া, আবার বৃষ্টির উৎপত্তি হইয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই প্রক্রিয়া অবিশ্রান্ত চলিতেছে, সুতরাং অবিশ্রান্ত পৃথ্বীদেহেরও ক্ষয় সাধিত হইতেছে। স্যার চার্লস্ লায়াল নামক এক জন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত স্পেন দেশের একটি প্রদেশের অধিকাংশ বৃষ্টির জলে ক্ষয়িত হইতে দেখিয়াছিলেন। এইরূপে এক সমুদ্রই সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপকুল-ভাগকে ও পরম্পরাসম্বন্ধে জনপদের অভ্যন্তর-প্রদেশকে ক্রমাগত ক্ষয় করিতেছে।

এই সংহারিকা শক্তির প্রতিরোধ জন্য প্রকৃতির কোন উদ্ধারিকা শক্তি থাকা বিশেষ আবশ্যক। ভূমিকম্পই এই উদ্ধারিকা শক্তি। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ভূকম্প-প্রভাবে পৃথিবীর কোন স্থান উন্নত এবং কোন

স্থান অবনত হইয়া যায়। জল ক্রমাগত পৃথিবীর চারিদিক সমানরূপে ক্ষয় করিয়া, পৃথ্বীদেহ গোল করিয়া তুলিতেছে; বস্তুতঃ বিশুদ্ধরূপে গোলাকার করাই জলের একমাত্র কার্য্য। পৃথিবীর স্থানবিশেষ উন্নত ও অবনত হইলে, জলের আর তাদৃশ সংহারিণী শক্তি থাকে না। যেহেতু, কোন ভূভাগ নিম্নতর হইয়া পড়িলে, জলও উহার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নে পড়িয়া যায়, সুতরাং নিম্নস্থ জল উচ্চতর ভূভাগকে সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। পৃথিবীর যে অংশে সমুদ্রের অত্যাচার অধিক, প্রকৃতির অদ্ভুত নিয়মে সেই অংশেই প্রবল ভূমিকম্প অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানেই ভূমিকম্প ও আগ্নেয় গিরির উৎপাত দৃষ্ট হয়। ফলে সমুদ্রের সংহারিকা শক্তি যেমন ক্ষয়সাধনোদ্দেশে পৃথ্বীতল আক্রমণ করিতেছে, ভূমিকম্পরূপ প্রকৃতির উদ্ধারিকা শক্তিও তেমনই সেই আক্রমণে বাধা দিয়া, পৃথিবীকে রক্ষা করিতে যত্ন করিতেছে। ভূমিকম্পের ন্যায় কোন উদ্ধারিকা শক্তি না থাকিলে পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকিত না। বিজ্ঞান-বিশারদ স্যার জন্ হর্শেল কহিয়াছেন, যদি পৃথিবী, সৃষ্টির সময়ে যে ভাবে ছিল, চিরকাল সেই ভাবে থাকিত, যদি কোন প্রকারে উহার পরিবর্ত্তন না হইত, তাহা হইলে সংহারিকা শক্তির কার্য্যবশতঃ এত দিনে পৃথিবীর চিহ্ন মাত্রও থাকিত

না। বস্তুতঃ ভূকম্পবলে পৃথ্বীতল পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়াই, উহা অক্ষুণ্ণভাবে রহিয়াছে, নতুবা সমস্ত ভূভাগই অনন্ত-বিস্তৃত বারি-রাশির গর্ভে বিলীন হইয়া যাইত।

গুরু গোবিন্দ সিংহ।

মহামতি নানক বিবিধ ধর্ম্ম-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া যে অভিনব ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন, সে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ পূর্ব্বে যোগীর ন্যায় নিরীহভাবে আপনাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অনুমোদিত কার্য্যানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিল। কালক্রমে মুসলমান ভূপতিদিগের অত্যাচারে এই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কষ্টের একশেষ হইয়া উঠিল। ইহাদের অনেকে পশুর ন্যায় বধ্য-ভূমিতে নিহত হইতে লাগিল। এই নিদারুণ সময়ে শিখসমাজে এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তিনি স্বশ্রেণীর—স্বজাতির অসহনীয় যন্ত্রণা দেখিয়া, অধ্যবসায় ও উৎসাহসহকারে উহার প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তেজস্বিতা ও সাহস, শিখদলে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের মধ্যে জীবনী শক্তির সঞ্চার করিল। এই অবধি একপ্রাণতা, সমবেদনা প্রভৃতি শিখদিগের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, এই অবধি

মহা-পুরুষের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শিখগণ মহাসত্ত্ব হইয়া উঠিল। এই মহাপুরুষ ও মহামন্ত্রদাতার নাম গোবিন্দ সিংহ।

গোবিন্দ সিংহই প্রথমে শিখদিগকে সাম্যসূত্রে সম্বদ্ধ করেন, গোবিন্দ সিংহের প্রতিভা-বলেই হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে। গোবিন্দ সিংহই শিখদিগের হৃদয়ে জাতীয় ভাবের পরিপোষক। শিখগণ যে তেজস্বিতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও যুদ্ধকুশলতায় ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে, গোবিন্দ সিংহই তাহার মূল। তেজস্বিতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতায় শিখ-গুরু-সমাজে গোবিন্দ সিংহের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ভারতবর্ষের সকলকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে, নানকের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে গোবিন্দ সিংহের ন্যায় আর কেহ যত্ন করেন নাই।

১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নানকের মৃত্যু হইলে অঙ্গদ নামক তাঁহার এক জন প্রধান শিষ্য শিখদিগের গুরু হন। অঙ্গদের পরে অমরদাস ও রামদাস যথাক্রমে শিখ-সম্প্রদায়ের অধিনায়কতা করেন। চতুর্থ গুরুর নাম অর্জ্জুনমল। এপর্য্যন্ত যাঁহারা শিখদিগের গুরু হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অর্জ্জুনেরই নানকের-প্রচারিত

ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশিষ্ট অধিকার ছিল। অর্জ্জুন আপনাদের ধর্ম্মপুস্তক আদিগ্রন্থ সংগৃহীত ও বিধিবদ্ধ করেন। এই সময়ে জাহাঁগীরের পুত্র খসরু বিদ্রোহী হইয়া পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন; অর্জ্জুন তাঁহার অনুকূলে আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করাতে, অর্জ্জুনকে জাহাঁগীর দিল্লীতে আনিয়া কারাবদ্ধ করেন। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে কারাগারের অসহনীয় যাতনায় অথবা ঘাতকদিগের প্রাণান্তক অস্ত্রের আঘাতে অর্জ্জুনের মৃত্যু হয়। অর্জ্জুনের পর তৎপুত্র হরগোবিন্দ গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হন। পিতার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে মুসলমানদিগের প্রতি হরগোবিন্দের ঘোরতর বিদ্বেষ জন্মে। এপর্য্যন্ত শিখগণ যে নিরীহভাবে কালাতিপাত করিতেছিল, অর্জ্জুনমলের মৃত্যুতে সে নিরীহভাব দূর হয়; প্রতিহিংসাবৃত্তি হরগোবিন্দকে অস্ত্রধারণে ও যুদ্ধকার্য্যে উত্তেজিত করিয়া তুলে। হরগোবিন্দ সর্ব্বদাই দুই খানি তরবারি ধারণ করিতেন; কেহ উহার কারণ জিজ্ঞাসিলে, তিনি অম্লানবদনে উত্তর দিতেন, "এক খানি পিতার অপঘাতমৃত্যুর প্রতিশোধ জন্য, অপর খানি মুসলমানদিগরে শাসনের উচ্ছেদ জন্য রক্ষিত হইতেছে।" হরগোবিন্দই শিখসমাজে অস্ত্রশিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক।

হরগোবিন্দের পাঁচ পুত্র—গুরুদিত্য, সুরত সিংহ,

তেগবাহাদুর, অন্নরায় ও অটলরায়। ইহাঁদের মধ্যে পিতার জীবদ্দশাতে সর্ব্বজ্যেষ্ঠটির মৃত্যু হয়। শেষ দুই জন অপুত্রক অবস্থায় পরলোক-গত হন এবং অবশিষ্ট দুই জন মুসলমানদিগের অত্যাচারে পঞ্জাবের উত্তরবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুরু-দিত্যের দাহরমল ও হররায় নামে দুই পুত্র ছিল। ইহার মধ্যে দ্বিতীয়টি হরগোবিন্দের পদ গ্রহণ করেন। ১৬৬১ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় দুই পুত্র রাম-রায় ও হরেকৃষ্ণের মধ্যে গুরুর পদ লইয়া গোলযোগ আরম্ভ হয়। কোন প্রকারে ঐ গোলযোগের মীমাংসা না হওয়াতে, উভয় পক্ষ দিল্লীতে গমন করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব শিখদিগকে আপনাদের গুরু নির্ব্বাচন করিয়া লইতে অনুমতি দেন, এই অনুমতিক্রমে শিখগণ হরেকৃষ্ণকে গুরুর পদে বরণ করে। কিন্তু দিল্লীত্যাগের পূর্ব্বেই ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বসন্ত রোগে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হয়, তদীয় খুল্লপিতামহ তেগবাহাদুর শিখদিগের অধিনায়ক হন। তেগবাহাদুর গোবিন্দ সিংহের পিতা। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা নগরে গোবিন্দ সিংহের জন্ম হয়।

হরগোবিন্দের ন্যায় তেগবাহাদুরও কষ্টসহিষ্ণু ও

* তেগ শব্দের অর্থ তরবারি। তরবারি অবিশ্বাসীকে তেগবাহাদুর বলা যাইতে পারে।

পরিশ্রমশীল ছিলেন। যখন শিখগণ তাঁহাকে গুরুর পদে বরণ করে, তখন তেগবাহাদুর নম্রভাবে কহিয়াছিলেন যে, তিনি হরগোবিন্দের অস্ত্র-ধারণের উপযুক্ত পাত্র নহেন। যাহা হউক, তেগবাহাদুর তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী রামরায়ের চক্রান্তজালে জড়িত হইয়া কারারুদ্ধ হন। কারাগারে দুই বৎসর অতিবাহিত হয়, পরিশেষে তিনি জয়পুর-রাজ জয়সিংহের বিশেষ অনুগ্রহে মুক্তি লাভ করিয়া, কিয়ৎকাল আসাম, পাটনা প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক পঞ্জাবে উপনীত হন। পঞ্জাবে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তেগবাহাদুর পুনর্ব্বার দিল্লীশ্বরের বিরাগ-ভাজন হইয়া উঠেন, অবিলম্বে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়, তেগবাহাদুর পরাজিত ও বন্দীভূত হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলে, আওরঙ্গজেব তাঁহার মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা করেন।

দিল্লীতে গমনসময়ে তেগবাহাদুর স্বীয় তনয় গোবিন্দকে পিতৃ-দত্ত তরবারি দিয়া গুরুর পদে বরণ পূর্ব্বক এই কথা বলেন যে, মৃত্যুর পরে তাঁহার দেহ যেন, শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য না হয়, এবং এক সময়ে যেন, এই মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া হয়। গোবিন্দ, পিতার এই শেষ আদেশ পালন করিতে প্রতিশ্রুত হন। তেগবাহাদুর পুত্রের প্রতিশ্রুতিতে প্রফুল্ল হইয়া দিল্লীতে গমন করেন। এই স্থানে ১৬৭৫

খ্রীষ্টাব্দে ঘাতক দিগের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। ধর্ম্মান্ধ আওরঙ্গজেব নিহত গুরুর দেহ প্রকাশ্য রাস্তায় নিক্ষেপ করেন।

যখন তেগবাহাদুরের মৃত্যু হয়, তখন গোবিন্দ সিংহের বয়স পনর বৎসর। পিতার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড, স্বজাতির ও স্বদেশের অধঃপতন, গোবিন্দ সিংহের মনে এরূপ গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, যবন-বিনাশ ও যবন-হস্ত হইতে স্বদেশের উদ্ধারসাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তিনি সকলকে একত্র করিয়া একটি মহাসম্প্রদায়ে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু বয়সের অল্পতা ও মোগল শাসন-কর্ত্তৃগণের সাবধানতাপ্রযুক্ত গোবিন্দ পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ঐ সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই। যাহা হউক, তিনি একজন শিষ্য দ্বারা পিতার ছিন্ন মস্তক আনয়ন পূর্ব্বক প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিয়া যমুনার তটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করেন। এই স্থানে মৃগয়ায়, পারস্য ভাষা অধ্যয়নে ও স্বজাতির গৌরবকাহিনী শ্রবণে তাঁহার সময় অতিবাহিত হয়।

মোগল-সাম্রাজ্য আওরঙ্গজেবের সময়েই উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। আওরঙ্গজেব ছলে, বলে ও কৌশলে অনেককে দিল্লীর শাসনাধীন করেন। যে

কয়েকটি পরাক্রান্ত রাজ্য পূর্ব্বে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, আওরঙ্গজেবের সমকালে তাহা নানা কারণে উচ্ছৃঙ্খল ও ক্ষমতাশূন্য হইয়া পড়ে। এক দিকে প্রতাপ সিংহের অভাবে রাজপুত-রাজ্য ক্ষীণ-তেজ হয়, অপর দিকে শিবজীর বিরহে নব অভ্যুদিত মহারাষ্ট্র-রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। আওরঙ্গজেবের সময়ে শিবজীই কেবল স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে আওরঙ্গজেবের রাজত্ব অনেকাংশে নিষ্কণ্টক হয়। শিবজীর অভাবে আওরঙ্গজেবের প্রতাপ প্রায় সকলেরই ভীতিস্থল হইয়া উঠে। মোগল-সাম্রাজ্যের এই প্রতাপের সময়ে গোবিন্দ সিংহ শিখদিগের উপর নূতন রাজত্ব স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হন।

যমুনার পার্ব্বত্য প্রদেশে অপরিজ্ঞাত অবস্থায় গোবিন্দ প্রায় কুড়ি বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহার মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য সংগৃহীত হয়। গোবিন্দ এক্ষণে পঞ্জাবে আগমন পূর্ব্বক এই শিষ্য-দল লইয়া জীবনের মহৎ ব্রত সাধনে উদ্যত হইলেন। শিক্ষা তাঁহার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়াছিল, ভূয়োদর্শন তাঁহার বিচারশক্তি মার্জ্জিত করিয়াছিল এবং প্রগাঢ় কর্ত্তব্য-জ্ঞান তাঁহার স্বভাব উন্নত করিয়াছিল; এক্ষণে একতা ও স্বার্থ-ত্যাগ তাঁহার উদ্দেশ্য হইল, তিনি সাধনায়

অটল, সহিষ্ণুতায় অবিচলিত ও মন্ত্রসিদ্ধিতে অনলস হইলেন। তিনি শিষ্যদিগের হৃদয়ে তেজ ও সাহসের সঞ্চার করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় শিষ্যগণ সজীব হইয়া উঠিল। গোবিন্দ এই রূপে প্রবল-পরাক্রম রাজত্বে বাস করিয়া, সেই রাজত্বই বিপর্য্যস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

গোবিন্দ সাহসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও স্বজাতি-বৎসল ছিলেন। তিনি পৃথিবীর পাপাচার দেখিয়া দুঃখিত হইতেন, এবং বিধর্ম্মীর অত্যাচারে আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। তিনি মনে করিতেন, মানবজাতি সাধনাবলে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ইচ্ছার একাগ্রতা, হৃদয়ের তেজস্বিতা সম্পাদন জন্য এখন প্রগাঢ় সাধনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি বিগত সময়ের ঋষি ও যোদ্ধৃবর্গের কার্য্যকলাপ সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন। কিরূপে মানুষের সুশিক্ষা হইতে পারে, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় ছিল। তিনি শিষ্যদিগকে মহাবল করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে ভূতপূর্ব্ব কাহিনী কীর্ত্তন করিতেন। দেবতাগণ কি রূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া দৈত্যগণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, সিদ্ধগণ কি রূপে আপনাদের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,

গোরক্ষনাথ ও রামানন্দ কি রূপে আপনাদের মত্ত প্রচারিত করিয়াছেন, মহম্মদ কিরূপ কষ্ট ও কিরূপ বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম পূর্ব্বক আপনাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া, লোকের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার বর্ণনীয় বিষয় ছিল। তিনি আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ভৃত্য বলিয়া উল্লেখ করিতেন। তিনি কহিতেন, ঈশ্বর কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে আবদ্ধ নহেন, হৃদয়ের সরলতা ও মনের সাধুতাতেই তিনি বিরাজ করিতেছেন।

গোবিন্দ এইরূপে আপনার মত প্রচার করিলেন। এই রূপে তাঁহার শিষ্যগণ পৌরাণিক কাহিনী ও উদার উপদেশ শ্রবণ করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়সম্পন্ন হইতে লাগিল। গোবিন্দ যত্নপূর্ব্বক বেদ পাঠ করিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াও, তিনি শারীরিক তেজস্বিতা লাভে উদাসীন থাকেন নাই। কথিত আছে, তিনি নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে যাইয়া অর্জ্জুনের বিক্রম; অর্জ্জুনের তেজস্বিতা লাভের নিমিত্ত গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিতেন। এইরূপ আত্মসংযম ও এইরূপ গভীর চিন্তায় শিখ-সমাজে গোবিন্দের সম্মান ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

গোবিন্দ এক্ষণে নূতন পদ্ধতিতে শিখ-সমাজ সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শিষ্যদিগকে

একত্র করিয়া কহিলেন, "সর্ব্বান্তঃকরণে একেশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে, কোনরূপ পার্থিব পদার্থ দ্বারা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরম পিতার মাহাত্ম্য বিকৃত করা হইবে না। সকলেই সরলহৃদয়ে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিবে। সকলেই একতাসূত্রে সম্বদ্ধ হইবে। এই সমাজে জাতির নিয়ম থাকিবে না, কুল-মর্য্যাদার প্রাধান্য রক্ষিত হইবে না। ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ভদ্র ইতর, সকলেই সমান ভাবে পরিগৃহীত হইবে, সকলেই এক পঙ্ক্তিতে এক হাঁড়িতে ভোজন করিবে। ইহা তুরুকদিগকে বিনাশ করিতে যত্নপর থাকিবে, এবং সকলকেই সজীব ও সতেজ হইতে শিক্ষা দিবে।" গোবিন্দ ইহা কহিয়া স্বহস্তে এক জন ব্রাহ্মণ, এক জন ক্ষত্রিয় ও তিন জন শূদ্রজাতীয় বিশ্বস্ত শিষ্যের গাত্রে চিনির সরবত প্রক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদিগকে খাল্‌সা * বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং যুদ্ধকার্য্য ও বীরত্বের পরিচয়সূচক 'সিংহ' উপাধি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ নিজেও ঐ উপাধি ধারণ করিয়া গোবিন্দ সিংহ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

* আরব্য ভাষা হইতে "খাল্‌সা" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। উহার অর্থ, পবিত্র, বিমুক্ত। যে ভূমির সহিত অপরের কোনও সংস্রব নাই, সচরাচর সে ভূমিকে খাল্‌সা বলা যায়। গুরু গোবিন্দ হইতেই শিখদিগের সংজ্ঞা "খাল্‌সা" ও উপাধি "সিংহ" হয়।

গোবিন্দ সিংহ এইরূপে জাতিগত পার্থক্য দূর করিয়া সকলকেই এক সমাজে আনয়ন করিলেন। জাতি-ভেদ রহিত হওয়াতে উচ্চ বর্ণের শিষ্যগণ প্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু গোবিন্দ সিংহের তেজস্বিতা ও কার্য্য-কুশলতায় সে অসন্তোষ দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইল না। শিষ্যগণ গুরুর অনির্ব্বচনীয় তেজো-মহিমা দর্শনে আর বাঙ নিষ্পত্তি না করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা একেশ্বর-বাদী হইয়া আদি গুরু নানক ও তাঁহার উত্তরাধিকারি-বর্গের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল, রাজপুতদিগের ন্যায় সিংহ উপাধিতে বিশেষিত হইয়া দীর্ঘ কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতে লাগিল, এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, প্রকৃত যোদ্ধার পদে অধিষ্ঠিত হইল। তাহাদের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ হইল*। "ওয়া! গুরুজি কা খাল্সা! ওয়া! গুরুজি কি ফতে!" (গুরু কৃত-কার্য্য হউন, জয়-শ্রী তাঁহাকে শোভিত করুক) তাহা-দের সম্ভাষণ-বাক্য হইল। গোবিন্দ সিংহ গুরুমঠ নামে একটি শাসন-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অমৃত-সরে এই সমাজের অধিবেশন হইতে লাগিল। যাহাতে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ হয়, যাহাতে

* গোবিন্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত আকালীনামক শিখসম্প্রদায় অদ্যাপি নীল-বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকে।

শিখ-সমাজ অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে অটল থাকে, তাহাই গুরুমঠের লক্ষ্য হইল।

গোবিন্দ সিংহ বিষয়-সুখে আপনার নিস্পৃহা দেখাইবার জন্য এবং শিষ্যদিগকে ভোগবিলাস হইতে দূরে রাখিয়া অভীষ্ট বিষয়সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিবার নিমিত্ত, নিজের সমস্ত সম্পত্তি শতদ্রুতে নিক্ষেপ করিলেন। একদা একজন শিষ্য সিন্ধুদেশ হইতে প্রায় ৫০,০০০ টাকা মূল্যের দুই খানি সুন্দর হস্তাভরণ আনিয়া তাঁহাকে দিল। গোবিন্দ প্রথমে ঐ আভরণ লইতে অসম্মত হইলেন; কিন্তু শেষে শিষ্যের আগ্রহ দেখিয়া, অগত্যা উহা হস্তে ধারণ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি নিকটবর্ত্তী নদীতে যাইয়া ঐ আভরণের একখানি জলে ফেলিয়া দিলেন। শিষ্য গুরুর এক হাত আভরণশূন্য দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গোবিন্দ কহিলেন, "একখানি অলঙ্কার জলে পড়িয়া গিয়াছে।" শিষ্য ইহা শুনিয়া, একজন ডুবরী আনিয়া তাহাকে কহিল যে, যদি সে অলঙ্কার তুলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে পাঁচশত পুরস্কার টাকা দেওয়া যাইবে। ডুবরী সম্মত হইল। শিষ্য, কোন্ স্থানে অলঙ্কার পড়িয়া গিয়াছে, তাহা ডুবরীকে দেখাইয়া দিবার জন্য, গুরুকে বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিল। গোবিন্দ নদীতে অবশিষ্ট অলঙ্কার খানি ফেলিয়া দিয়া

কহিলেন, "ঐখানে পড়িয়া গিয়াছে।" শিষ্য ভোগসুখে গুরুর এই রূপ অসাধারণ বিতৃষ্ণা দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং আপনিও সর্ব্বপ্রকার ভোগবিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবনের মহৎ ব্রত সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল।

গোবিন্দ সিংহ বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, ধীরভাবে ও সংযতচিত্তে নূতন শিখ-সমাজ সংগঠিত করিলেন। যে শিখগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া, উদাসীনভাবে কালাতিপাত করিত, তাহারা এক্ষণে একপ্রাণ হইয়া এই অভিনব সমাজে সম্মিলিত হইল। গোবিন্দ সিংহ এক সাধনায় সিদ্ধ হইলেন, কিন্তু ইহা অপেক্ষা উৎকট সাধনা অসিদ্ধ রহিল। তিনি পরাক্রান্ত মোগলদিগের মধ্যে সশস্ত্র খালসাদিগকে "সিংহ" উপাধিতে বিশেষিত করিয়াছিলেন, ধর্ম্মান্ধ পণ্ডিত ও পীরদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে এক সমাজে নিবেশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাটের সৈন্য ধ্বংস করিতে পারেন নাই। গোবিন্দ সিংহ আসন্ন-মৃত্যু পিতার বাক্য, পিতৃ-সমীপে নিজের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া, পিতৃ-হন্তা অত্যাচারী মোগলদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন।

ভারতবর্ষের সমুদয় স্থলে মোগল-শাসন বদ্ধমূল ছিল না। অন্তর্ব্বিদ্রোহ প্রভৃতিতে মোগল-সাম্রাজ্যে

প্রায়ই গোলযোগ ঘটিত থাকিত। মোগল-সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা বাবর নিরুদ্বেগে রাজত্ব করিতে পারেন নাই, তৎপুত্র হুমায়ুন পাঠানবংশীয় শের শাহের পরাক্রমে রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া দেশান্তরে ষোল বৎসর অতিবাহিত করেন। আকবর যদিও প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতা ও যুদ্ধকুশলতায় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ভারতবর্ষে আধিপত্য করেন, যদিও তাঁহার বিচক্ষণতায় হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে জাতিবৈর অনেকাংশে তিরোহিত হয়, তথাপি তাঁহাকে স্বীয় তনয় সেলিমের কঠোর ব্যবহারে ও বঙ্গদেশের বিদ্রোহে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। শাহ জহাঁ জীবদ্দশাতেই সিংহাসন লইয়া পুত্রদিগকে পরস্পর যুদ্ধ করিতে দেখেন, পরিশেষে ইঁহাদের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাপন্ন আওরঙ্গজেবের ক্রূরাচারে কারাগারে আবদ্ধ হন। আওরঙ্গজেব ধর্ম্মান্ধতা ও কুটিলতায় ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাঁহার কঠোর রাজনীতিতে অনেকেই তৎপ্রতি বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে। আকবর হিন্দু ও মুসলমানদিগকে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত করিতে যে যত্ন করেন, সে যত্ন আওরঙ্গজেবের রাজ্য হইতে সর্ব্বাংশে দূরীভূত হয়। আওরঙ্গজেব নিজের সন্দিগ্ধতা ও কঠোর ব্যবহারে অনেক শত্রু সংগ্রহ করেন। এক দিকে রাজপুতগণ স্বজাতির অপমানে উত্তেজিত হইয়া

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, অপর দিকে শিবজী বিধর্ম্মীর শাসনে বিরক্ত হইয়া স্বদেশীয়ের নিস্তেজ শরীরে তেজস্বিতার সঞ্চার করেন। এক্ষণে আবার গোবিন্দ সিংহ তেজস্বিতা দেখাইয়া, জাঠদিগের মধ্যে নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন।

গোবিন্দ সিংহ এই উৎকট সাধনায় কৃতকার্য্য হইবার জন্য আপনার শিষ্যদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া, এক এক দল শিক্ষিত সৈন্য প্রস্তুত করিলেন। অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত ও উন্নত শিষ্যগণের উপর এই সৈন্য-দলের অধ্যক্ষতা সমর্পিত হইল। এতদ্ব্যতীত গোবিন্দ সিংহ শিক্ষিত পাঠান-সৈন্য আনিয়া আপনার দল পরিপুষ্ট করিলেন। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত-সমূহের পাদদেশে তিনটি দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইল। নাহনের নিকটবর্ত্তী পবন্ত নামক স্থানে তাঁহার একটি সেনানিবাস ছিল। এই সেনানিবাস ব্যতীত আনন্দপুর নামক স্থানে তাঁহার পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত আর একটি আশ্রয় স্থান হস্তগত হইল। গোবিন্দ সিংহের তৃতীয় আশ্রয় স্থান চম্পকুমার; উহা শতদ্রুর তটে অবস্থিত। পার্ব্বত্য প্রদেশে সৈন্য স্থাপন পূর্ব্বক মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করা সুবিধা-জনক ভাবিয়া, গোবিন্দ সিংহ অগ্রে ঐ দুর্গ ও সেনা-নিবাস সমূহ সুরক্ষিত করিলেন এবং পরে পার্ব্বত্য প্রদেশের সর্দ্দার-

দিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে উদ্যত হইলেন। এইরূপে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দ সিংহ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি ধর্ম্মপ্রচারক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া নানা স্থান হইতে শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে যুদ্ধবীর সৈন্যাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া, সেনা-নিবাস নিরাপদ করিতে ও দুর্গসমূহের শৃঙ্খলাবিধানে যত্নপর হইলেন।

মাহনের সর্দ্দারের সহিত গোবিন্দ সিংহের প্রথম যুদ্ধ হয়। গোবিন্দের সেনাদলে যে সমস্ত পাঠান ছিল, বেতন বাকী পড়াতে, তাহারা গোবিন্দ সিংহের সম্পত্তি লুঠ করিবার জন্য শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করে। এই যুদ্ধে গোবিন্দ সিংহের জয়লাভ হয়। শিখগুরুর এই প্রথম কৃতকার্য্যতা দর্শনে অনেকে আসিয়া গোবিন্দ সিংহের দলভুক্ত হয়। ইহার কিছুকাল পরে মিয়া খাঁ নামক একজন মোগল সর্দ্দার নাদনের রাজা ভীমচাঁদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। নাদনরাজ্য শ্রীনগরের উত্তরপশ্চিমে ও জম্বুর দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। জম্বুরাজ এই যুদ্ধে মিয়া খাঁর পক্ষ অবলম্বন করাতে ভীমচাঁদ গোবিন্দ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন; গোবিন্দ সৈন্যগণের সহিত ভীমচাঁদের সাহায্যার্থ সমর-স্থলে উপনীত হন। এ যুদ্ধেও গোবিন্দ সিংহ ও ভীমচাঁদের সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়। মোগলসর্দ্দার ও জম্বু-রাজ পরা-

জিত হইয়া শতদ্রু উত্তরণ পূর্ব্বক পশ্চাদ্ধাবিত শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন।

মিয়া খার সহিত যুদ্ধের পর দিলির খাঁর পুত্র গোবিন্দ সিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন; কিন্তু শিখদিগের কৌশলে তাঁহাকেও অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। দিলির খাঁ পুত্রের অকৃতকার্য্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া, সমুদয় সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক হুসেন খাঁকে প্রেরণ করেন। প্রথম যুদ্ধে শিখদিগের কয়েকটি দুর্গ হুসেনের অধিকৃত হয়, কিন্তু শেষে হুসেন খাঁ পরাজিত ও নিহত হন। গোবিন্দ সিংহ যুদ্ধের সময়ে উপস্থিত ছিলেন না, কেবল তাঁহার অনুচরগণই বিশিষ্ট পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ঐ যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল।

গোবিন্দ সিংহ ও তাহার শিষ্যগণের এইরূপ পরাক্রম দর্শনে আওরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হইয়া লাহোর ও সর্হিন্দ প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে উহার প্রতিবিধান করিতে কঠোর ভাবে আদেশ করিলেন। সম্রাটের কঠোর আজ্ঞায় এবার যুদ্ধের সমুদ্ধ অয়োজন হইল। ১৭০১ অব্দে দিলির খাঁ গোবিন্দের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। আওরঙ্গজেবের পুত্র মাজ্জমও ইহার সহিত সম্মিলিত হইতে যাত্রা করিলেন। এই সংবাদে শিখগণের অনেকে ভীত হইয়া সন্নিহিত পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গোবিন্দ সিংহ তাহাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া

অনেক তিরস্কার করিলেন, কিন্তু তাহারা নিবৃত্ত হইল না। অবশেষে ৪০ জন সাহসী শিখ, গুরুর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইল। গোবিন্দ সিংহ আনন্দপুর নামক স্থানে মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন, তাঁহার মাতা ও স্ত্রী, দুইটি শিশু সন্তানের সহিত সর্হিন্দে পলায়ন করিলেন। কিন্তু পরিশেষে ঘটনাক্রমে শিশুসন্তানদ্বয় মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হইয়া নির্দ্দয়রূপে নিহত হইল। এদিকে গোবিন্দ সিংহ রাত্রিকালে মোগল সৈন্যের অগোচরে চম্পকুমারে উপস্থিত হইলেন।

শত্রুগণ চম্পকুমারও আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে খোজা মহম্মদ ও নহর খাঁ মোগল সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই সেনাপতিদ্বয় গোবিন্দ সিংহকে আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া, এক জন দূত পাঠাইলেন, কিন্তু গোবিন্দ সিংহের পুত্র অজিত সিংহ আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হইয়া দূতকে তিরস্কার পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। দূত তিরস্কৃত হইয়া শিবিরে প্রত্যাগত হইলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। অজিত সিংহ বিশিষ্ট পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। গোবিন্দ সিংহ জয়ের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া অন্ধকাররাত্রিতে চম্পকুমার পরিত্যাগ করেন। প্রস্থান-সময়ে দুই জন পাঠান

তাঁহাকে দেখিতে পায়, উহারা পূর্ব্বে গোবিন্দ সিংহের নিকটে উপকার পাইয়াছিল, এজন্য উপস্থিত সময়ে তাঁহার বিশিষ্ট সাহায্য করে। গোবিন্দ সিংহ এইরূপে চম্পকুমার হইতে বিলোলপুরনগরে উপনীত হন। এই স্থানে পীর মহম্মদ নামক এক জন মুসলমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। গোবিন্দ সিংহ পীর মহম্মদের সহিত এক সময়ে একত্র কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন; পীর মহম্মদ এজন্য সহাধ্যায়ীর প্রতি বিশিষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করেন। গোবিন্দ পীর মহম্মদের সহিত আহার করিয়া ছদ্মবেশে ভাতিণ্ডা নামক স্থানে উপস্থিত হন। এই স্থানে শিষ্যগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধ-বেশে সজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকটে উপনীত হয়, গোবিন্দ এই শিষ্য দলের সাহায্যে অনুসরণকারী মোগলদিগকে তাড়াইয়া হান্সী ও ফিরোজপুরের মধ্যবর্ত্তী দমদমায় উপস্থিত হন। যে স্থানে গোবিন্দ সিংহ মোগলদিগকে তাড়িত করেন, সেই স্থানে অদ্যাপি "মুক্তসর" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

দমদমায় অবস্থিতিকালে গোবিন্দ সিংহ "বিচিত্র নাটক" ও এক খানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গোবিন্দ শিখদিগের দশম গুরু। এই জন্য তৎপ্রণীত পুস্তক "দশম পাত্সা কা গ্রন্থ" নামে প্রসিদ্ধ হয়। গোবিন্দ সিংহ যে সমস্ত যুদ্ধ করেন, বিচিত্র নাটকে তৎসমুদয়ের

বর্ণনা আছে। গোবিন্দ সিংহ যখন এইরূপ নির্জ্জনবাসে পুস্তকরচনা-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন আওরঙ্গজেব তাঁহাকে আপনার নিকটে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু গোবিন্দ প্রথমে এই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই, প্রত্যুত ঘৃণাসহকারে কহিয়াছিলেন যে, তিনি সম্রাটের প্রতি কোনরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। এক্ষণেও খাল্‌সাগণ সম্রাটের পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রতিশোধ লইবে। ইহার পরে তিনি নানকের ধর্ম্মসংস্কার, অর্জ্জুন ও তেগবাহাদুরের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড এবং নিজের অপুত্রকাবস্থার উল্লেখ করিয়া কহেন, "আমি এক্ষণে কোনরূপে পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ নই। স্থিরচিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি। সেই রাজার রাজা অদ্বিতীয় সম্রাট্ ব্যতীত কেহই আমার ভীতি-স্থল নহেন।" এই উত্তর পাইয়াও আওরঙ্গজেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পুনর্ব্বার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। গোবিন্দ সিংহ এবার সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বেই বৃদ্ধ মোগল সম্রাটের পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

১৭০৭ খ্রীঃ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র মাজ্জম "বাহাদুর শাহ" নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। বাহাদুর শাহ যখন তদীয় ভ্রাতা কামবক্সের সহিত দক্ষিণাপথে যুদ্ধে

ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তিনি গোবিন্দ সিংহকে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। গোবিন্দ সিংহ উপস্থিত হইলে, বাহাদুর তাঁহার প্রতি বিলক্ষণ সৌজন্য দেখাইয়া, তাঁহাকে সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। গোবিন্দ সিংহ এইরূপে দিল্লীর সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আপনার শিষ্য-সম্প্রদায়ের শৃঙ্খলাবিধানে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তিনি এক জন পাঠানের নিকটে কতকগুলি ঘোটক ক্রয় করেন। ঘোটকের মূল্যের জন্য, পাঠান এক দিন গোবিন্দ সিংহকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করে। গোবিন্দ এই অপমান সহিতে না পারিয়া, পাঠানকে বধ করেন। ইহাতে নিহত পাঠা-নের পুত্র প্রতিহিংসায় এরূপ বিচলিত হয় যে, সে পিতৃহন্তার প্রাণনাশে সর্ব্বদা চেষ্টা পাইতে থাকে। একদা সুযোগ পাইয়া, ঐ পাঠান-তনয় গোবিন্দের শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করে। ঐ আঘাতেই গোবিন্দ সিংহ মানবলীলা সম্বরণ করেন। ১৭০৮ খ্রীঃ অব্দে গোদাবরীর তীরবর্ত্তী নাদর নামক স্থানে এই শোচনীয় কাণ্ড ঘটে। মৃত্যুর সময়ে গোবি-ন্দের বয়স আটচল্লিশ বৎসর হইয়াছিল।

গোবিন্দ সিংহ শিখ-সমাজের জীবন-দাতা। তাঁহার সময় হইতেই শিখগণ মহাবল বলিয়া বিখ্যাত হয়। গুরু নানক ধর্ম্মসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কিন্তু গোবিন্দ সিংহ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের একপ্রাণতা ও স্বাধীনতার নিদান। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁহার সাধনা গভীর, তাঁহার বীরত্ব অসাধারণ এবং তাঁহার মানসিক স্থিরতা অতুল্য। তিনি সমুদয় জাতিকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ ও এক-ধর্ম্মাক্রান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া নিজের গভীর উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। সকলে এক উদ্দেশ্যে একসূত্রে আবদ্ধ না হইলে যে, নির্জ্জীব ভারতের উদ্ধার নাই, ইহা বিলক্ষণরূপে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। এই জন্যই তিনি হিন্দু মুসলমানকে এক ভূমিতে আনয়ন করেন, এই জন্যই তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রকে এক সূত্রে নিবদ্ধ করেন, এবং এই জন্যই তিনি গর্ব্বসহকারে সম্রাট আওরঙ্গজেবকে লিখেন, "তুমি হিন্দুকে মুসলমান করিতেছ, কিন্তু আমি মুসলমানকে হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিতেছ, কিন্তু সাবধান! আমার শিক্ষা-বলে চটক শ্যেনকে ভূতলে পাতিত করিবে।" তেজস্বী শিখ-গুরুর এই বাক্য নিষ্ফল হয় নাই, তাঁহার মন্ত্র-বলে চটকগণ যথার্থই শ্যেনকে যথোচিত শিক্ষা দিয়াছে।

হরগোবিন্দ শিখ-সমাজে অস্ত্র-ব্যবহারের প্রবর্ত্তক। কিন্তু গোবিন্দ সিংহ সেই অস্ত্রের সহিত এমন তেজ প্রসারিত করিয়াছেন যে, তাহাতে শিখগণ তেজস্বী,

সাহসী ও সুযোদ্ধা বলিয়া ইতিহাসের আদরণীয় হইয়াছে। হরগোবিন্দের অস্ত্র কেবল আত্মরক্ষার্থ প্রয়োজিত হইত, গোবিন্দ সিংহের অস্ত্র সমস্ত ভারতবর্ষকে পরাধীনতা-শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত করিতে নিযুক্ত থাকিত। গোবিন্দ সিংহ অতি তরুণ বয়সে নিহত হন, তিনি আরও কিছু দিন জীবিত থাকিলে অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিতেন। মহম্মদ নিরাপদে মদিনায় পলায়ন করিতে না পারিলে, সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস বোধ হয়, বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত। গোবিন্দ সিংহ আপনার মহামন্ত্রসাধনে প্রবৃত্ত না হইলে, শিখদিগের নাম বোধ হয়, ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইত। যাহা হউক, গোবিন্দ সিংহ অল্প বয়সে, অল্প সময়ের মধ্যে, শিখসমাজে যে জীবনী শক্তি ও তেজস্বিতা প্রসারিত করেন, তাহারই বলে, নির্জ্জীব, নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ভারতে শিখগণ আজ পর্য্যন্ত সজীব রহিয়াছে, তাহারই বলে রামনগর ও চিনিয়াবালার * নাম আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসে বিরাজ করিতেছে। গোবিন্দ সিংহের নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশ্রিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার নাম ভূমণ্ডলে অবিনশ্বর হইয়া রহিয়াছে। যখন জন-কোলাহল-পূর্ণ

* রামনগর ও চিনিয়াবালা পঞ্জাবের দুইটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধস্থান। এই দুই স্থানে ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধে শিখেরা অসামান্য পরাক্রম প্রদর্শন করে। দুই যুদ্ধেই ইঙ্গরেজপক্ষের বিস্তর ক্ষতি হয়। চিনিয়াবালার যুদ্ধে শিখেরা ইঙ্গরেজদিগের কামান ও পতাকা অধিকার করে।

সুদৃশ্য নগর বিজন অরণ্যে পরিণত হইবে, যখন শত্রুর দুরধিগম্য রাজপ্রাসাদ অজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অদীন-পরাক্রম বিদেশীর বিজয়পতাকায় শোভিত হইবে, যখন বিশাল তরঙ্গিণী স্বল্পতোয় গোষ্পদের আকার ধারণ করিবে, অথবা স্বল্পতোয় গোষ্পদ বেগবতী নদীর আকার ধারণ করিয়া জলধির উদ্দেশে প্রধাবিত হইবে, তখনও গোবিন্দ সিংহের তেজস্বিতা, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও উদারতা অবনীতলে জাজ্বল্যমান রহিবে, তখনও গোবিন্দ সিংহের পবিত্র নাম পবিত্র ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে।

সম্পূর্ণ।